দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

রাখিবন্ধন উৎসব ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ
— পৃঃ ২৫

বৈভবশালী ভারত গঠনে এগিয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ
— পৃঃ ১৭

৭৬ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা।। ১৯ আগস্ট, ২০২৪।। ২ ভাদ্র, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ২ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৯ আগস্ট - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

হাসপাতালে মমতার প্রশাসনিক তোষণনীতি বাংলাদেশকেও ছাড়াল, এই নরকবঙ্গ আমার নয় ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

মেয়েটা ডাক্তার হতে চেয়েছিল, মেরে দিল আপনার সরকার ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

যে কথা যায় না বলা... ☐ হরিনারায়ণ দাস ☐ ৮

অথ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ কথা ☐ চাণক্য পণ্ডিত ☐ ১১

অনুরাগের ছোঁয়া : ইট মারলে পাটকেল তো খেতেই হয় ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠি ☐ ১৪

ধারাবাহিক হিংসাত্মক নগ্ন অভ্যুত্থানের সাক্ষী থেকেছে বাংলাদেশ ☐ জয়দীপ রায় ☐ ১৬

বৈভবশালী ভারত গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ☐ মন্দার গোস্বামী ☐ ১৭

রাখিবন্ধন ও মহিলা সুরক্ষা ☐ পারুল মণ্ডল ☐ ২৩

রাখিবন্ধন উৎসব ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ☐ রাজদীপ মিশ্র ☐ ২৪

ঝুমকোলতার নান্দনিকতার মধ্যেই আসে রাখিপূর্ণিমা ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ২৭

প্রকৃতি-পরিবেশ-অরণ্য এবং বন্যপ্রাণ রক্ষা ☐ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ২৯

রাজশ্রী থেকে রাজর্ষি মহারানি অহল্যাবাঈ ☐ ড. সুনীতা শর্মা ☐ ৩১

রাজনারায়ণ বসু : স্বদেশীবোধ জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন মেলার আয়োজক ☐ দীপক খাঁ ☐ ৩৩

গোরক্ষার লক্ষ্যে ভারতে গো-আধারিত অর্থনীতি— কী ও কেন? ☐ ড. রাসবিহারী ভড় ☐ ৩৫

রক্ষাবন্ধন মানেই বেড়া বাঁধা—নিরাপদ দেশেই একমাত্র সৃষ্টি সুখ ☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ৩৬

বাংলা ভাষার শুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষা ☐ প্রবীর ভট্টাচার্য ☐ ৩৮

শেখ হাসিনার পতন এবং ভারতের তুষ্টীকরণ রাজনীতির ভবিষ্যৎ ☐ ডাঃ সুভাষ সরকার ☐ ৪৩

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হিংসার তীব্র প্রতিবাদ ☐ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ☐ **অঙ্গনা : ২১** ☐ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ☐ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ☐ **স্মরণে : ৪৭** ☐ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯**

প্রকাশিত হবে ২৬ আগস্ট, ২০২৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২৬ আগস্ট, ২০২৪

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণময় জীবন

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে তাঁর আবির্ভাব। সমাজ ও রাষ্ট্রের উত্থানের জন্য তিনি সর্বদা কর্মে লিপ্ত থেকেছেন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় তাঁর বর্ণময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, নন্দলাল ভট্টাচার্য, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল চক্রবর্তী, ড. রাকেশ দাশ প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রীয় একাত্মতার মাধ্যম

বলা হইয়া থাকে, ভারতবর্ষে বারো মাসে তেরো উৎসব। সমস্ত পার্বণ তথা উৎসবের প্রচলন হইয়াছে এই দেশের মানুষের রাষ্ট্রবোধকে উজ্জীবিত রাখিবার লক্ষ্যে। অনাদি অতীতকাল হইতে এই রাষ্ট্রবোধ উজ্জীবিত রহিয়াছে বলিয়াই এই দেশের রাষ্ট্রজীবন সতত প্রবহমান। বৈদেশিক আক্রমণ হইয়াছে, বিধর্মীদের শাসন কায়েম হইয়াছে কিন্তু রাষ্ট্রজীবন এই দেশে অবারিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনে রাখিবন্ধন এমন একটি উৎসব যাহা নিমেষে পরকে আপন করিয়া লয়। দূরকে নিকট করিয়া থাকে। বিশ্বকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। সংস্কৃতের রক্ষাবন্ধনকে বাঙ্গালি রাখিবন্ধন করিয়া লইয়াছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে এই পর্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণাদি সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে রহিয়াছে, ইন্দ্রের স্ত্রী শচীদেবী তাঁহার স্বামীর প্রাণ রক্ষার্থে দৈত্যরাজ বলির হস্তে রাখি বাঁধিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবী বলিরাজার হস্তে রাখি বাঁধিয়া স্বীয় স্বামী নারায়ণকে ভক্তের প্রেমবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। গ্রিক কিংবদন্তীতেও উল্লেখ রহিয়াছে, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে আলেকজান্ডার-পুরুর যুদ্ধে আলেকজান্ডার পত্নী রোজানা স্বামীর প্রাণ রক্ষার্থে পুরুর হস্তে রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়াছিলেন। মুঘল বাদশা হুমায়ুনের নিকট চিতোরের রানি কর্ণাবতীর রাখি প্রেরণের কাহিনি লইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাখিভাই' কবিতা রহিয়াছে। ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে তাহা নানাভাবে পালিত হইয়া থাকে। কেরালা ও তামিলনাড়ুর ন্যায় সমুদ্রোপকূলবর্তী রাজ্যের মৎস্যজীবীরা নারিকেলের মালা গাঁথিয়া তাহার দ্বারা তাহাদের নৌযানগুলিকে বন্ধন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তিশগড়ের কৃষকরা এইদিন ভূ-মাতাকে তৃণগুচ্ছের দ্বারা বন্ধন করিয়া অধিক শস্যাদি ফলনের প্রার্থনা করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডের জনজাতি সমাজের মানুষ অরণ্যরক্ষার শপথ লইয়া বৃক্ষে বৃক্ষে রক্ষাবন্ধন করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে রাখিবন্ধন হইল রক্ষা করিবার অঙ্গীকার। পাঠান-মুঘল শাসনামলে এই দেশের মাতা-ভগিনীর কোনোরূপ নিরাপত্তা ছিল না। বিধর্মীদের হস্তে পদে পদে তাঁহাদিগের সম্ভ্রমহানির সম্ভাবনা ছিল। ভারত ইতিহাসের সেই মধ্যযুগে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া রাজপুতনার মাতা-ভগিনীরা যে কোনো পুরুষের হস্তে রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া তাঁহাকে ভ্রাতৃত্বে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষার অঙ্গীকার আদায় করিয়া লইতেন। সেই পুরুষও সহোদরা জ্ঞানে সেই নারীকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করিতেন এবং তাহা পূরণও করিতেন। এ কারণেই রাখিবন্ধন পর্বটি কালক্রমে ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া নিছক একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল।

রাখিবন্ধনের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যটি অনুধাবন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের দিনগুলিতে উৎসবটি নূতনভাবে প্রয়োগ করিলেন। ইংরাজ শাসকের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি অকাল রাখিবন্ধন শুরু করিয়াছিলেন। পরস্পরের হস্তে এক টুকরা রঙিন রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করিয়াছিলেন। তাহার প্রভাব এতই সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল যে ব্রিটিশ রাজশক্তির সেটেল্ড ফ্যাক্টকে আনসেটেল্ড করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল। দেশ, জাতি, ধর্ম ও সমাজ রক্ষায় একটি উৎসব যে কত শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে রাখিবন্ধন তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। সেই কারণেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রাখিবন্ধন উৎসবকে তাহাদের ছয়টি উৎসবে শামিল করিয়াছে। তাহাদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় রাখিবন্ধন ক্ষুদ্র পাবিরারিক পরিসর হইতে বাহির হইয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ এবং রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সেবিকাগণ রাখিপূর্ণিমাকে কেন্দ্র করিয়া কয়েক দিন ধরিয়া সমগ্র দেশে আপামর জনসাধারণের হস্তে রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া সমগ্র দেশে এক সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ নির্মাণ করিয়া থাকেন। নগরবাসী, গ্রামবাসী, গিরিবাসী, জনজাতি, এমনকী দেশরক্ষায় সদাজাগ্রত সৈনিক ভ্রাতা-ভগিনীদের হস্তে রাখি বন্ধন করিয়া একাত্মতার বার্তা প্রদান করিয়া থাকেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভরতবংশীয়গণও এই উৎসব উদ্‌যাপন করিয়া সেইসব দেশেও সৌভ্রাতৃত্বের আবহ নির্মাণ করিতেছেন। রাখিবন্ধনের গুরুত্ব তথা সৌভ্রাতৃত্বের এইরূপ পরিবেশ দেখিয়া তাহারাও তাহাদের দেশে ১০ এপ্রিল 'ভ্রাতা-ভগিনী দিবস' শুরু করিয়াছেন। ইদানীং তাহা এত প্রসার লাভ করিয়াছে যে তাহাদের দেশের ৪৯টি অঙ্গরাজ্য দিনটির স্বীকৃতির দাবি জানাইয়াছে। প্রকৃত অর্থেই বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর একটি বড়ো মাধ্যম হইল রাখিবন্ধন উৎসব।

সুভাষিতম্

সুখমাপতিতং স্যেবং দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।। (মহাভারত)

জীবনে সুখকে যেমন পরিপূর্ণ উপভোগ করতে হয়, তেমনই দুঃখকেও সহজভাবে স্বীকার করতে হয়। কেননা সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্তিত হতে থাকে।

হাসপাতালে মমতার প্রশাসনিক তোষণনীতি বাংলাদেশকেও ছাড়াল

এই নরকবঙ্গ আমার নয়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ভেবেছিলাম সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ইসলামি কট্টরবাদী নৃশংসতার বস্ত্রটা নগ্ন করে দেব। শুরু করেও লেখা পালটাতে বাধ্য হলাম। তুলে রাখলাম আগামী সংখ্যার জন্য। শিউরে উঠলাম এটা দেখে যে, কীভাবে বাংলাদেশের নৃশংসতাকে হার মানাতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক, দলীয়, জেহাদি কট্টরবাদ আর দালাল চক্র। আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়ার ওপর নৃশংস অত্যাচার আর হত্যার কাটাছেঁড়ার অসভ্য মানসিকতা আমার নেই। একটাই জবাব— 'স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।'

কিছুদিন আগে তৃণমূলের এক দেশবিরোধী মহিলা সাংসদের মুখে এই কথা শুনে হাসি পেয়েছিল। ঘুষ ঢাকতে স্ব-সাজিত বিপ্লবী 'কা-কা' ডেকেছিল। হয়তো এটাই তৃণমূল। অত্যাচারিত মহিলা পড়ুয়ার জন্য তাঁর আওয়াজ কোনোমতেই বেরুবে না। এরপরেও তিনি ভোটে জিতেছেন।

আপাতত এরাজ্য আমার চেতনায় নেই। এই ঘটনায় এই রাজ্যের পরজীবীরা (পড়ুন বুদ্ধিজীবী) এখনো প্রতিবাদে নামেননি। তাদের মোমবাতি গলে সলতেতে জল সেঁধিয়েছে। নপুংসক 'সেন-সরকারের' বংশ আর সদ্যোজাত কবিরা হারিয়ে গিয়েছেন। দেবাদিদেবের ত্রিশূল নিয়ে নোংরামি করা মাতৃগর্ভের লজ্জারা কোথায়? যমপুরের (পড়ুন যাদবপুর বিশ্বদ্যিালয়) বুকে গিটারওয়ালাদের দেখা যাচ্ছে না। মহিলা সতীর্থদের কাছে ক্ষাত্রতেজ প্রদর্শনকারীরা ইঁদুরের গর্তে সেঁধিয়ে গিয়েছেন।

বানতলা, ধানতলা বা তাপসী মালিকের ঘটনা রাজ্যে মানুষের মাথা হেঁট করেছিল। হাথরাস বা উন্নাওয়ের ঘটনা দিয়ে তা চাপা দেওয়া যাবে না। স্বাধীনতার পর থেকে এরাজ্যের তিনটি মূল প্রশাসনের জন্মই হয়তো হয়েছিল মানুষের মাথা হেঁট করতে। ইতিহাস তাই বলে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অত্যাচারী ও অযোগ্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। জ্যোতি বসু ছিলেন সখের কমিউনিস্ট। এখন মমতা খামখেয়ালি ও খাপছাড়া। তেরো বছরে রাজ্যের হেঁট হওয়া মাথা কেটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। পুলিশ হামাগুড়ি দিয়ে নেতাদের পায়ের নীচে রাত্রিযাপন করছে।

বাংলাদেশের ইসলামি ধর্মীয় কট্টরবাদের উত্থান নিয়ে প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক ২০১৭ সালে লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশ—দ্য নিউ আফগানিস্তান'। এরাজ্যের সাংবাদিকরা মমতার অনৃতভাষণে অভ্যস্ত। তাই মমতার ফাঁসির মৌখিক সুপারিশ বা সিবিআই তদন্তের কথা যে কতটা ভয়ংকর প্রশাসনিক জেহাদি কট্টরবাদ, তারা তা বোঝেন না। সিবিআই তদন্তের জেনারেল কনসেন্ট মমতা অনেকদিন আগেই তুলে নিয়েছেন। কেবল আদালত কিংবা মমতা নিজে তা সুপারিশ করতে পারেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই বলেন, চোর প্রমাণ হলে ফাঁসিতে চড়ব। মমতার ফাঁসির হুকুম অনেকটা সেরকম। অভিষেক অপরাধীকে এনকাউন্টার করতে চাইছেন। আশ্চর্য যে, দুজনেই অভিযুক্তের মৃত্যু চাইছেন। কেন? বিচার হলে কি ঝুলি থকে বেড়াল বেরিয়ে পড়বে? রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালে গড়ে ওঠা দালালচক্রের সন্ধান পাওয়া যাবে। জানা যাবে মাথা কারা? সকলেই জানেন যে, রাজ্যের হাসপাতাল আর দালাল সমার্থক হয়ে গিয়েছে।

> মমতার ফাঁসির হুকুম। অভিষেক অপরাধীকে এনকাউন্টার করতে চাইছেন। আশ্চর্য যে, দুজনেই অভিযুক্তের মৃত্যু চাইছেন। কেন? বিচার হলে কি ঝুলি থকে বেড়াল বেরিয়ে পড়বে?

সিভিক ভলান্টিয়ার কারা? কাদের সুপারিশে নিয়োগ? কোনো আইনি পদ্ধতি না মেনে ২০১৩ থেকে তাদের বেআইনি নিয়োগ শুরু হয়। ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট সে নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু চাকরি বাতিল করেনি। যা করা উচিত ছিল। আর সেটা হলে ২০১৯ নিয়োগ পাওয়া আরজি করের এই পশুর চাকরি খতম হয়ে যেত। এই জঘন্যতম ঘটনা হয়তো ঘটত না। একজন মেধাবী ও সুযোগ্য চিকিৎসক পেতেন রোগীরা। অযোগ্যদের মহানুভবতা দেখানোর খেসারত এই পড়ুয়া চিকিৎসকটিকে দিতে হতো না।

সিভিক ভলান্টিয়ারদের যান নিয়ন্ত্রণ, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনসহায়তা এবং তদারকিতে পুলিশকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তাতে রাজনৈতিক দালালি আর তোলাবাজি বেড়ে যায়। শুনেছি, কালীঘাট এলাকার মমতার ঘনিষ্ঠ এক পুলিশ অফিসারের বদান্যতায় এই নরপশুর নিয়োগ হয়েছিল। তাতে সে 'দাদা' হয়ে ওঠে। অনেকবার লিখেছি, বাঙ্গালি 'ঘুমকাতর' জাতি। স্বাধীনতার পর থেকে দুটি সরকারকে তিন দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় রেখেছিল। সেই ট্র্যাডিশন চলছে। জাতির জাগরণ না হলে তার ক্ষমতার ধারে শ্যাওলা জমে তার ক্ষয় ঘটায়, যেমন ঘটছে এই রাজ্যে। তাই এই ক্ষয়িষ্ণু বঙ্গীয় উপত্যকা এখন আর আমার নয়। *(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)*

মেয়েটা ডাক্তার হতে চেয়েছিল মেরে দিল আপনার সরকার

বহুরূপেষু দিদি,

আপনি নিশ্চই লজ্জা পেয়েছেন। মুখে তো তাই বলছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তেমন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে প্রশ্নটা করা। কলকাতা শহর মানে তো একটা বড়ো ব্যাপার। অনেকে গর্ব করে বলেন ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। আহা! হয়তো ওই মেয়েটাও সেটাই ভাবত। এই শহর মেয়েদের জন্য নিরাপদ বলেই বিশ্বাস করত। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের রাজ্যে ওসব কিছু হয় না ভেবেই কর্মস্থলেই মেয়েটা ঘুমাতে গিয়েছিল নিশ্চিন্তে। তারপর সে একটা বীভৎস স্বপ্ন দেখল। সত্যি বলছি দিদি যদি ওটা দুঃস্বপ্ন হতো! মেয়েটা ডাক্তার হতে চেয়েছিল। অনেককে বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজেই চলে গেল মর্গে। আগেই দেহটা তছনছ হয়ে গিয়েছিল। এবার তদন্তের জন্য আরও কাটাছেঁড়া! আর যে যা করে থাকুক, আমি মনে করি এই নৃশংস মৃত্যুর দায় রাজ্য সরকারের।

দিদি ভাবুন তো, কলকাতার মতো 'বিখ্যাত' এবং 'সুরক্ষিত' শহরের একটি মেডিক্যাল কলেজের সেমিনার কক্ষে এক চিকিৎসকের ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত মৃতদেহ মিলল! ভাবা যায়! আমাদের দেশে হাসপাতালও তাহলে সুরক্ষিত নয়? এর দায় কার? রাজ্যের প্রতিটি মানুষের মনে এই প্রশ্নটাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমিও সেটাই বলতে চাইছি। বিষয়টি যে তদন্তসাপেক্ষ তা নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে তো! আর তখনই মনে হলো আপনার হাতেই তো স্বাস্থ্য দপ্তর! দিদি, আপনিই তো পুলিশ মন্ত্রী। যা যা হয়েছে সবটাই তো আপনার হাতে থাকা দপ্তরে। তাহলে নীল-সাদা রং করা হাসপাতালগুলোর ভিতরের খবর আপনার কাছে কি পৌঁছায় না!

এমন অনেক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দেশ তোলপাড় হয়েছে। কিন্তু দিদি, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রীর অপমৃত্যু অনেক বেশি ভয়াভয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াল। আপনি তো কথায় কথায় অন্য রাজ্যের তুলনা টানেন। কিন্তু দিদি, দিল্লিতে ফিজিওথেরাপির ছাত্রী এবং হায়দরাবাদের পশুচিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যা ঘটে বাসে, নির্জন রাস্তায়। আর কলকাতায় চিকিৎসকের দেহ কিন্তু পাওয়া গিয়েছে তাঁর নিজের মেডিক্যাল কলেজে। মেডিক্যাল কলেজগুলি চিকিৎসক-পড়ুয়ার ঘর-বাড়ি, সেখানেই তাঁদের সব চাইতে বেশি সময় থাকতে হয়। সেই পরিসরকে নিরাপদ, কাজ ও বিশ্রামের উপযোগী করে তোলার দায় অবশ্যই কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। অবশ্যই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। অন্য কেউ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে আপনি গাল দিতে পারতেন, সরিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু নিজেকে নিজে সরাবেন কী করে?

সিসিটিভি, নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও যদি সেই নিরাপত্তা না দেওয়া যায়, তবে তা আর কেবল দায় থাকে না। সেটা অপরাধ। এই ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ অপরাধী। আপনি অপরাধীর প্রাণদণ্ড দাবি করছেন। ভাইপো এক কাঠি এগিয়ে এনকাউন্টার চেয়ে বসেছেন। সেটা কি দায় এড়ানোর জন্য নয়? কিন্তু দায় কি এত সহজে এড়ানো যায় দিদি? কিন্তু যেখানে কলেজ কর্তৃপক্ষই এমন ভয়ানক দায়হীনতার অপরাধে অপরাধী, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী সে বিষয়ে কী করছেন?

সব চেয়ে বেশি অভিযোগ ছিল ওই হাসপাতালের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। জুনিয়র চিকিৎসকদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে ঘটনার চারদিন পরে তিনি পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছিলেন। জানিয়েছিলেন কারও চাপে নয়, স্বেচ্ছায় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুধু অধ্যক্ষ পদ নয়, চাকরি থেকেই তিনি ইস্তফা দিয়ে দেন। কী আশ্চর্য দিদি, সেদিন বিকেল গড়াতে না গড়াতেই শহরের অন্য একটি মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনালের অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ স্বাস্থ্যভবন। মানে আপনার দপ্তর। নিশ্চয়ই আপনার নির্দেশে?

কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। কেন একটি অসুরক্ষিত সেমিনার কক্ষকে মহিলা চিকিৎসকদের বিশ্রামের জায়গা বলে নির্ধারণ করা হয়েছিল? কেন নিরাপত্তা রক্ষীরা টহল দেয় না? কেন ছাত্রী ও মহিলা ডাক্তাররা তাঁদের ওপর অহরহ ঘটে যাওয়া শারীরিক নিগ্রহ নিয়ে কথা বললে তা অনুধাবন সহকারে শোনা হয় না? অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে অভিযোগ জানালে কেন কর্মীদের কানাকানি শোনা যায়, চাকরিটা তো রাখতে হবে, বেশি কিছুতে না জড়ানোই ভালো?

সন্দীপ ঘোষ তো আপনার অনুগামী। গত লোকসভা নির্বাচনের পরে তাকে সবুজ আবির মেখে নাচতেও দেখা গিয়েছে। ছবি ঘুরছে মোবাইলে মোবাইলে। দিদি, মনে রাখতে হবে হাসপাতালের ভিতরে কোনও চিকিৎসক এই ভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অকস্মাৎ ঘটে না। কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের শিথিলতার সুযোগ নিয়েই ঘটে। রোগীর আত্মীয়দের হাতে আক্রান্ত হন জুনিয়র ডাক্তাররা। আছে দালালচক্র, কলেজ কর্তৃপক্ষের উপরে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছড়ি ঘোরানো, কর্মচারীদের মধ্যে দলীয় বাহুবলীদের উপস্থিতি। আপনার আমলে এমন ভাইয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে দিদি!

আর রাজনীতির প্রভাব? সেটা পুলিশ প্রশাসনের উপরেও। না হলে কী করে ঘটনাটির যথাযথ তদন্তের আগেই মেয়েটির মৃত্যুকে 'আত্মহত্যা' বলে আখ্যা দিলেন পুলিশকর্তা? এরাজ্যে যে কোনো গুরুতর নারী-নির্যাতনের ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর যে জঘন্য চেষ্টা আপনি করছেন, সেটা এবার পুলিশ করল।

আপনার পরের উদ্যোগটাও রাজনীতি হিসাবে দারুণ। সব তথ্য প্রমাণ এলোমেলো করে দেওয়ার পরে সিবিআইকে তদন্ত করতে বলবেন। এর পরে আপনার দল গলাবাজি করে বলবে, 'কী করতে পারল সিবিআই? কিন্তু দিদি, সময় মনে হচ্ছে কমে আসছে। এই সব মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়ার সময় কমে আসছে। □

যে কথা যায় না বলা...

শেখ হাসিনা মুখে মুখে যতই অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলুন না কেন, তিনিও একজন কট্টর মুসলমান। তিনি ইসলামি কট্টরবাদকে দমনের জন্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছেন। আবার বাংলাদেশকে ইসলামি কট্টরবাদের উর্বরভূমিও বানিয়ে ছেড়েছেন।

হরিনারায়ণ দাস

গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। আসলে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। আর আধঘণ্টা বেশি অবস্থান করলে উন্মত্ত জনতা তাঁকে হত্যা করে ফেলত। একপ্রকার বিনাবাধায় রাজধানীর সবচেয়ে সুরক্ষিত বাসভবনে হাজার হাজার মানুষ ঢুকে পড়ে। তারপর চলে নির্বিচার লুটপাট। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা প্রথম আলো লিখেছে, পোষা কুকুর থেকে শুরু করে শাড়ি সবই হলো লুট।'

বিশ্ববাসী টিভির পর্দায় এসব দৃশ্য দেখেছে। অধিকাংশই ছাত্র। সঙ্গে ভদ্রচেহারার সুবেশী মানুষজন। বিনা অনুমতিতে দেশের সম্পদ লুট করে নিচ্ছে, এতে তাদের কোনো অনুতাপ নেই। দ্বিধাহীন নিঃসংকোচ। বরং যুদ্ধজয়ের আনন্দ। উন্মাদনা। অনেকে লুটের মাল পাশে রেখেই শোকরানা নামাজ পড়া শুরু করে দিয়েছেন। কেউ আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে স্লোগান দিচ্ছিল। একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ছাড়া আর কোনো ধর্মাবলম্বী লুণ্ঠনের সময় এভাবে নিজ স্রষ্টার নাম নেয় আমার জানা নেই। এই অনুতাপহীনতার উৎস কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর মেলাতে পারলে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। মুসলমানদের প্রধান মজহবি গ্রন্থ কুরানের সুরা আনফালে যুদ্ধজয়ের পর নিহত কাফের (বিপরীত বিশ্বাসের মানুষের) সম্পদ (যাকে গনিমতের মাল বলা হয়েছে) ভাগাভাগি করে নেওয়ার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া আছে। এতে দলনেতা কত ভাগ পাবে, আক্রমণকারী কত ভাগ পাবে— তা স্পষ্ট বলা আছে। অনেকটা দস্যুদলের লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগের মতো।

পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের লুটপাটের ইতিহাস তো দীর্ঘ। যে তরুণরা আজ লুটপাটের খেলায় উল্লসিত, তারা তো এটা জেনিটিক্যালি পেয়েছে। সেই ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় হিন্দুর সম্পত্তি লুট, ৫০ ও ৬৪-এর দাঙ্গায় লুট, ১৯৭১-এ হিন্দুদের সম্পত্তি লুট, ১৯৯০ ও ২০০১-এ আবার হিন্দুর সম্পত্তি লুট। কাফেরদের সম্পত্তি লুটের এই ধারাবাহিক ইতিহাস তো তাদের রক্তে।

আবুল বারকাতের গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু শত্রু সম্পত্তি আইনে বাংলাদেশের হিন্দুদের ২৬ লক্ষ একর বা ১০,৫২২ বর্গ কিলোমিটার ভূমি দখল করে নিয়েছে সরকারের লোকেরা। গত ৭০ বছর ধরে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা প্যালেস্তাইনের জন্য মায়াকান্না করে যাচ্ছে। প্যালেস্টাইনের আয়তন ৬,০২৫ বর্গকিলোমিটার। সরকারিভাবে এরা কতো বড়ো লুট করেছে একবার ভেবে দেখুন। অন্যান্য লুটের কথা আর নাই বা বললাম। আসলে ভিন্ন কোনো ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ হুট করে কোনো ইসলামি দেশের মানুষের মানসিকতা ধরতে পারবেন না। তাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে না মিশলে বিচ্ছিন্ন কিছু ধারণা পাবেন। কখনো তাদের খুব উদার, কখনো খুব রক্ষণশীল, কখনো খুব কট্টর মনে হবে। সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হয়ে যাবে।

একজন মুসলমানের মজহবি বিশ্বাসের যাত্রা শুরু হয়— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, এই আপ্তবাক্য দিয়ে। এর অর্থ আল্লা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ প্রেরিত দূত। অর্থাৎ অন্য কোনো স্রষ্টা বা উপাস্যের ধারণা (বহুত্ববাদ) আনার সুযোগ নেই। অতএব অপরাপর সব উপাস্যকে তুমি অবলীলায় অস্বীকার ও অসম্মান করতে পারো। আর অন্য উপাস্যের অনুসারীদের সঙ্গে কী আচরণ করবে কোরানে তাও স্পষ্ট লেখা আছে। কোরানের সুরা আল ইমরানে বলা হয়েছে, মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। কাফেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে না, তাদের সঙ্গে থাকা যাবে না ধারণা থেকে ১৯৪৭-এ পাকিস্তানের সৃষ্টি। পাকিস্তানের উপাঙ্গ কেটে নিয়ে বাংলাদেশ নামে অদ্ভুত দর্শন দেশের জন্ম হয়েছে।

প্রতিটি দেশ সৃষ্টিতে কোনো না কোনো দার্শনিক বা ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে। বাংলাদেশের সেটা শূন্য। বাংলাদেশ জন্মের সময় গণতন্ত্র, জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ করলেও শেখ মুজিব ক্ষমতায় এসে ইসলামি উম্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পাগল হয়ে ওঠেন। স্থাপন করেন ইসলামি ফাউন্ডেশন। এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য, সৌদি আরবের স্বীকৃতি। না হলে বাংলাদেশের মানুষ হজে যেতে পারবে না।

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! ১৬৮৬-তে ইঙ্গ-মুঘল যুদ্ধ হয়েছিল

তাতে সুবেদার শায়েস্তা খাঁ জিতেও পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন বাদশা আওরঙ্গজেবের কারণে। ইংরেজরা হজযাত্রীদের জাহাজ আটকে দেওয়ার হুমকি দিলে ভারতের বাদশা বাঙ্গলার সুবেদারকে তিনি আদেশ দিতে বাধ্য হন বঙ্গের মাটিতে ইংরেজদের ঠাঁই দিতে। যার ফলে সুতানটিতে তারা মৌরসিপাট্টা খুলে বসে। যার চূড়ান্ত পরিণতি কলকাতা শহরের পত্তন। শেষমেশ বঙ্গের মসনদ দখলের মাধ্যমে ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ বিজয়ের যাত্রা শুরু। ইসলাম অনুসারিদের কাছে মজহব এতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল বিষয়। মজহব তাদের কাছে ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়। তারা জৈবিক আচরণীয় কর্মের মতোই মজহবকে আবশ্যক করে ফেলেছে। এর ছাপ পড়ে তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়। এরা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে অনেক উদার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অসচেতন মুহূর্তে বহুচর্চিত বিশ্বাসটি ভেসে উঠে। পাশ্চাত্য যুক্তি বুদ্ধি কাজ করার আগেই তা সক্রিয় হয়ে যে কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলে।

আর বাংলাদেশের মানুষের কাছে দেশের অস্তিত্বের অঙ্গ হিসেবে ধর্মকে নেওয়া হয়। ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার একটাই অজুহাত ধর্ম। তারা জানে এই ধর্মের ইস্যু টিকে না থাকলে এই দেশ টিকে থাকবে না। শেখ মুজিব সেটা খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন। তাই প্যান-ইসলামিক ঘরনার অনুসারীদের কাছে টেনে নেন। এর প্রতিক্রিয়া হয় দুটো। দূরে সরে যাওয়ারা মিলে জাসদ গঠন করে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। কাছে আসা অনুসারীরা তাঁর পাশে থেকেই তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। কারণ এইসব লোক থাকলে ইসলামিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। শেখ মুজিব সফল না হলেও তার দুই ধারার অনুসারীরা নিজ নিজভাবে সফল হয়েছে। শেখ মুজিবের পরের সরকাররা মজহবি উন্মাদনার উনুনে আরও ঘি ঢেলেছেন। তারা মানুষের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ ভারত। ভারতের মতো একটা অজগর আমাদের এভাবে বেষ্টিত করে না রাখলে আমাদের অনেক উন্নতি হতো। তারা সীমান্তের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে ১৯৭১-এর গণহত্যার চেয়ে ভয়াবহ বলে মানুষের কাছে তুলে ধরেছে। সেই সুরা আল ইমরানের বাণী অনুসারে তারা কাফেরদের আরও বেশি ঘৃণা করতে উৎসাহ দিয়েছে। আওয়ামি লিগকে ভারতের দালাল হিসেবে উপস্থাপন করতে সফল হয়েছে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশে সেনা শাসন ছিল। তারা মজহবকে দেশ শাসনের একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিল। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে একটি সাধারণ নির্বাচন হয়। সাংগঠনিক শক্তিমত্তায় আওয়ামি লিগের ধারে কাছে আসার মতো কোনো দল ছিল না। বিএনপি নিহত সামরিক শাসকের স্ত্রীকে এনে একটা জোড়াতালির দল দাঁড় করায়। তারা সব আসনে প্রার্থী পর্যন্ত দিতে পারেনি। কিন্তু দেখা গেল অপ্রস্তুত বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে ফেলল। তখন বোঝা গেল সাধারণ মানুষের ভেতরে ভারত তথা হিন্দুবিরোধিতা কোন পর্যায় গেছে।

আওয়ামি লিগ তার উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক চেহারা মুছে ফেলতে লাগল। দলের প্রধান নেত্রী শেখ হাসিনা দেখলেন তাঁর বাবার আমলে সংখ্যালঘুদের ভোটের যে গুরুত্ব ছিল এখন তা নেই। ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় শেখ মুজিবের হিসেব ছিল ২৫ শতাংশ হিন্দু ভোট যদি নেওয়া যায়, তার সঙ্গে ৫ শতাংশ মুসলমান ভোট পেলেই সরকার গঠন করা যাবে। তিনি সেটা করতেও সক্ষমও হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের নিরবচ্ছিন্ন দেশত্যাগ সেই হিসাব উলটে পালটে দেয়। তাই হিন্দুনির্ভরতা আওয়ামি লিগের জন্য বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়।

শেখ হাসিনা তাই মক্কা থেকে হজ করে এসে হিজাব নেকাব পরে পরবর্তী নির্বাচনী প্রচারণায় নামলেন। তাঁর এই মজহবি সুড়সুড়ানি লোকে খেলো। তিনি ১৯৯৬-এ ক্ষমতায় এলেন। এটা প্রমাণিত হলো, মজহবি ছাড়া এ দেশে নির্বাচনে জয়লাভ সম্ভব নয়। বাংলাদেশে ক্ষমতায় যাওয়া মানে জেনে বুঝে বাঘের পিঠে ওঠা। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো ক্ষমতা হস্তান্তর রক্তপাত ও অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছাড়া হয়নি। ২০০১-এর ক্ষমতা হস্তান্তরকে অনেকে ব্যতিক্রম বলে মনে করেন। কারণ শেষ হাসিনা নিজে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে তাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে মসনদ ছেড়ে আসেন। তারপর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। কিন্তু এরপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আওয়ামি লিগ কর্মীদের উপর যে নির্মম অত্যাচার নেমে আসে তা এখনো শেখ হাসিনাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে বেড়ায়। এরপর ২০০৫-এ গ্রেনেড হামলা করে তাঁকে হত্যার চেষ্টাও করা হয়। অল্পের জন্য তিনি বেঁচে যান।

শুধু হাসিনা নয়, ভারতকেও সমূলে উৎখাত করারও চেষ্টা চলেছে তখন। ২০০৪ সালে দশ ট্রাক অস্ত্র ধরা পড়ে চট্টগ্রামে। পরে অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে তৎকালীন সরকারের মদতে অসমের গেরিলা সংগঠন উলফার জন্য এই অস্ত্র আনা হয়েছিল। ২০০৬-এ কোনোভাবে বিএনপি ক্ষমতা বৃত্ত থেকে বের হতে রাজি হচ্ছিল না। শেষমেশ সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা থেকে সরানো হয়। তখনই আওয়ামি লিগ বুঝে যায়, 'মরো অথবা মারো' নীতিতে টিকে থাকতে হবে। ২০০৯ সাল থেকে সরানো হয়। ২০০৯ সাল থেকে শেখ হাসিনা সেই নীতির আলোকেই দেশ চালিয়ে এসেছেন। বিএনপি জামাতকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। পরপর তিনটি সাধারণ নির্বাচনে গায়ের জোরে রায় নিয়েছে আওয়ামি লিগ।

গত ১৫ বছর আওয়ামি লিগ বাংলাদেশে যা করেছে তা অভাবনীয়। সদর্থক ও নঞর্থক-উভয় অর্থে। আওয়ামি লিগ বাংলাদেশের পরিকাঠামোতে যে উন্নতি সাধন করেছে— তা সাধারণের কল্পনার অতীত ছিল। প্রথম প্রথম যখন শেখ হাসিনা এসব পরিকল্পনার কথা বলতেন, লোকে তখন হাসি ঠাট্টা করত। শেষে তাই বাস্তব করে দেখিয়েছেন। আর খারাপের কথা যদি বলি, তাঁর আমলে এতো দলীয়করণ হয়েছে, এতো আইনবহির্ভূত কাজ হয়েছে— তা অভাবনীয়। এর কুফল তাঁর পতনের পর পরই টের পাওয়া গেছে। এখন বাংলাদেশের একটা পুলিশ পোস্টেও পুলিশ দায়িত্ব পালন করছে না। দারোয়ান দিয়ে থানা পাহারা দেওয়া হচ্ছে। ঢাকার হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা হচ্ছে না। কারণ দলীয় পরিচয়ে এখানে সবাইকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল। এখন আক্রমণের ভয়ে এরা আত্মগোপন করেছেন। এমনকী হাইকোর্টের বিচারপতিরা পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়েছেন আক্রমণের ভয়ে। তাই হাইকোর্ট বন্ধ।

বাংলাদেশের কমবেশি সব মানুষ দুর্নীতিবাজ। তারা জানে সারা দিন খারাপ কাজ করে দুবার প্রার্থনা করে ফেললে সব পাপ জল হয়ে যায়। তাতেও যদি না যায় একবার ধুমধাম করে পাপের টাকায় হজটা করে ফেললেই হলো। এদেশে যে যত বড়ো দুর্নীতিবাজ সে তত ধার্মিক। তাই ধর্মের অভয়ে এখানকার লোকজন পাপকর্মে উৎসাহিত হন।

শেখ হাসিনা মুখে মুখে যতই অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলুন না কেন, তিনিও একজন কট্টর মুসলমান। তিনি ইসলামি কট্টরবাদকে দমনের জন্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছেন। আবার বাংলাদেশকে ইসলামি কট্টরবাদের উর্বরভূমিও বানিয়ে ছেড়েছেন। তার আমলে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের বেশভূষা পর্যন্ত পালটে গেছে। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেয়ে গেছে হিজাব বোরখায়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার চেয়ে জেহাদ চর্চায় অধিক আগ্রহী। এটা কেন হলো? শেখ হাসিনার পিতা ইসলামি ফাউন্ডেশন তৈরি করে যে বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তাকে পুষ্প পল্লবে সজ্জিত করেছেন শেখ হাসিনা। তিনি উপজেলা পর্যায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এখানে ভবিষ্যতের ইসলামি জঙ্গি তৈরির সকল আয়োজন করা হয়েছে। এক সময় কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা কোনো প্রকার সরকারি স্বীকৃতি পেত না। তাঁর আমলে তারা সরকারি স্বীকৃতি ও সরকারি চাকরিতে আবেদনের সুযোগ পায়। এই মডেল মসজিদগুলোতে ইমামের পদ প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার জন্য করা হয়েছে। যাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে সরকারি চাকরি পায়। তাঁর আমলে যত মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে, আর কোনো আমলে এমনটি হয়নি। বাংলাদেশে স্কুল স্থাপনের জন্য অনুমতি লাগে। মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য কোনো অনুমতি লাগে না। আর মাদ্রাসার তহবিলের অভাব হয় না। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও আমলারা ব্যাপকভাবে দুর্নীতিপরায়ণ। তারা ধর্মীয় আচারের অংশ হিসেবে আয়ের একটা অংশ জাকাত ফিতরা স্বরূপ এসব মাদ্রাসায় দেয়। তারা মনে করে এই দান যে কোনো বিবেচনায় মহত্তম। এ দানের ফলে মাদ্রাসাগুলো ফুলে ফেঁপে উঠছে। তারা হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের বিনা খরচে পড়ায়। এমনকী বিনামূল্যে খাদ্য ও আবাসনের ব্যবস্থা করে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে মূল ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) প্রস্তুত করা বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (এপিএসসি) ২০২৩ অনুসারে, কেবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী কমেছে। অর্থাৎ দিন দিন আধুনিক শিক্ষা ফেলে মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ঝুঁকে পড়ছে লোকজন।

যে সাপ পোষে, সেই ছোবল খায়। এবার সবচেয়ে বেশি সহিংস বিক্ষোভ হয়েছে ঢাকা নগরীর প্রবেশপথ যাত্রাবাড়িতে। এসব স্পর্শকাতর জায়গাকে বেছে নিয়ে জামায়েত ইসলামি মাদ্রাসা স্থাপন করেছে। এই মাদ্রাসায় সেনানিবাসের মতো করে শিক্ষার্থীরা থাকে। হাইকমান্ড ডাক দিলেই রাস্তায় নেমে পড়ে লাঠি সোটা হাতে নিয়ে। শুধু মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে এই মজহবি উন্মাদনা সীমাবদ্ধ থাকলে কথা ছিল না, তিনি সাধারণ শিক্ষায়ও হিন্দুবিদ্বেষ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। আগের বইগুলো থেকে অনেক হিন্দু লেখকের লেখা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন পাঠ্যপুস্তকে ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামি পোশাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার এই কাজে সমর্থন দিয়ে কিছু কবি সাহিত্যিক উঠে পড়ে লেগেছেন। তারা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য থেকে বাংলাদেশের সাহিত্যকে আলাদা করার জন্য কথায় কথায় ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও আরবি ফার্সি পুরে দিচ্ছে তাদের লেখায়। যাদের সেই এলেম নেই তারা আঞ্চলিক ডায়েলেক্ট ঢুকিয়ে সাহিত্যকে দূষিত করছেন। অর্থাৎ যেভাবে হোক পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য থেকে বাংলাদেশের সাহিত্যকে আলাদা করতে হবে। আরও স্পষ্ট করে বলতে হিন্দু সাহিত্য থেকে মুসলমান সাহিত্যকে আলাদা করতেই হবে।

শেখ হাসিনার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতা বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভাঙা শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে হিন্দুদের ঘরবাড়ি ও মন্দিরে আক্রমণ। এটা কেন? শেখ হাসিনা অপরাধ করতে পারেন, তার মৃত পিতার কী দোষ? সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, যে সেনাবাহিনী জনগণের সম্পদ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত তারা শেখ মুজিবের মূর্তি ভাঙার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে। ময়মনসিংহের শশী লজে দেড়শো বছরের পুরনো ভেনাসের মূর্তিটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেই ভেনাস তো কোনোভাবেই আওয়ামি লিগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রাহুল আনন্দের বাড়িতে আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ তার বাড়ি দেখতে এসেছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ। এ বাড়ি বাংলাদেশের জন্য গর্বের স্থান। এমনকী ২২ শ্রাবণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি ভাঙা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর। ভেঙে ও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত জাদুঘর, নভোথিয়েটার, বরেন্দ্র জাদুঘর, জয়নুল আবেদিন স্মৃতি সংগ্রহশালা।

এই আক্রমণ, এই বিদ্বেষ তাদের মজহবপ্রসূত। তাদের নবী মক্কাবিজয়ের পর নিজ হাতে মূর্তি ভেঙেছে। তাই তারা সুযোগ পেলেই মূর্তি ভেঙে সুন্নত বা পুণ্যি কামাতে চায়। তাদের মজহবে গান বাজনা, ছবি আঁকা, খেলাধুলা, নাটক তথা যে কোনো রকম যা আত্মার পরিতৃপ্তি দেয় এমন কর্মকাণ্ড হারাম বা নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের বিভিন্ন নায়িকাদের ফেসবুক পেজে লোকজনের মন্তব্যের কী ভয়ংকর ভাষা! তারা নারীর স্বাধীন বিচরণের বিরুদ্ধে। হাসিনা পতনের আন্দোলনের সময় রাস্তা ঘাটে যেসব স্লোগান লেখা হয়েছে তা দেখলে বিবমিষা জাগে। গণভবন দখলের পর বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রীর অন্তর্বাস দেখিয়ে উল্লাস করেছে। কী জঘন্য নারীবিদ্বেষ।

পৃথিবীর যে কোনো দেশের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে। কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো সেনানিবাসে ঢুকলেই অবাক হয়ে যাবেন। চারদিকে কেবল আরবি হরফে বিভিন্ন মজহবি বাণী লেখা। এত আরবি হরফ আরবের সেনানিবাসেও বোধহয় নেই। পাকিস্তান আমল থেকেই মজহবকে পুঁজি করে সেনাসদস্যদের মধ্যে একধরনের জেহাদি মানসিকতার জন্ম দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই তারা ভারত থেকে পাকিস্তানের প্রতি অধিক মানসিক নৈকট্য অনুভব করে। তাই তারা শেখ হাসিনার পতনের পর কোনো প্রকারের নির্দেশের অপেক্ষা না করেই মূর্তি ভাঙতে নেমে পড়েছে। এরা সুযোগ পেলে কাফের তথা বিধর্মীদের হত্যা করে পুণ্যি আদায় করতে পারত। কিন্তু চারদিক থেকে ভারত নামের এক শক্তিশালী দেশ ঘিরে থাকায় সে সাহস তাদের হয়নি। □

অথ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ কথা

চাণক্য পণ্ডিত

এ বিষয়ে লিখতে বা বলতে গেলে মন দুঃখ, দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয় এই কারণে যে, অখণ্ড ভারতবর্ষের যে অংশগুলি ইতিহাসের কোনো না কোনো দুর্ঘটনাকালে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটি ভারত বিরোধী ইসলামি শক্তি বা কমিউনিস্টদের দখলে। প্রতিবেশী দেশগুলিতে যেখানে সেনা অভ্যুত্থান, রাষ্ট্রনায়কের হত্যা অতি সাধারণ ও নিয়মিত ব্যাপার, সেখানে অন্যদিকে ভারত চিরাচরিত পরম্পরা অনুযায়ী সহমত, সহাবস্থান ও গণতন্ত্রের তীর্থস্থান। মাঝে অবশ্য ইন্দিরা গান্ধী কমিউনিস্ট দুর্বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভারতেও গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু জাগ্রত লোকশক্তির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ বা ভারতবাসীর জিন বা ডিএনএ-তে কট্টরবাদ, স্বৈরাচার, একনায়কতন্ত্র এসব নেই। তাই বিচ্ছিন্নভাবে কখনো কখনো এক দুজন এই পথে চললেও সেটি ভারতবর্ষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নয়।

এর জন্য আমরা আত্মশ্লাঘা বোধ করতে পারি কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। ভারতের মতো একটি শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক দেশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের সেমেটিক, ধর্মীয় কট্টরবাদী, ধর্মান্ধ, জঙ্গি ইসলামি বা ভারত বৈরী কমিউনিস্ট শক্তি পরিচালিত প্রতিবেশী দেশ সব সময় বিপজ্জনক। আফগানিস্তান থেকে মায়ানমার সর্বত্র একই চিত্র। নেপালের মতো হিন্দুবহুল দেশও কমিউনিস্টদের অধীন। সমস্যা আরও ঘনীভূত ও জটিল হয় যখন চীনের মতো ভারত-বৈরী কমিউনিস্ট শক্তি শকুনের মতো তীক্ষ্ণ এবং হায়নার মতো হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভারতের অভ্যন্তরীণ সুস্থিতি, সমৃদ্ধি, বিকাশকে নষ্ট করার সামান্যতম সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে নারাজ। ভারত যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস্, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশকে সঙ্গে নিয়ে চীনকে ঘিরছে, তেমনি পালটা যদি চীন ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিকে ঘাঁটি করে ভারতবিরোধী চক্রান্ত চালায় তবে তা ভারতের পক্ষে আরও বেশি অসুবিধাজনক।

এর অন্যতম কারণ, চীনের ভূরাজনৈতিক সুবিধা। প্রথমত, উপরোক্ত দেশগুলির কোনোটারই (তাইওয়ান ছাড়া) চীনের সঙ্গে স্থলসীমান্ত নেই। দ্বিতীয়ত, ভারতের মতো হিন্দু-মুসলমান সমস্যা চীনে নেই। তৃতীয়ত, ভারত-পাকিস্তান, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দুই দিকে একই ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, বেশভূষা সম্পন্ন কোটি কোটি মানুষ। বাংলাদেশি মুসলমান ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে, এমনকী সামনাসামনি নামাজ না পড়লে বাঙ্গালি হিন্দুর সঙ্গে আপাত ভাবে তাদের কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। চতুর্থত, মধ্যযুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত যেমন অনেক ছোটো ছোটো রাজা বা সামন্ত নিজেদের সংকীর্ণ সাময়িক স্বার্থের জন্য সম্পূর্ণ হিন্দু রাষ্ট্রের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে জেহাদি ইসলামি ও বিদেশি ঔপনিবেশিক শক্তিকে সাহায্য করে ভারতবর্ষের পরাধীনতাকে সহজ করেছে, ঠিক তেমনি আজও নির্বাচনী রাজনীতিতে যেন তেন প্রকারেণ নিজেদের জয়কে সুনিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ হিন্দুত্বের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী জিহাদি শক্তিকে সাহায্য করার মানসিকতা সম্পন্ন অনেক ছোটো ছোটো ব্যক্তিকেন্দ্রিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও কমিউনিস্টরা সক্রিয়।

> **কালের অমোঘ বিধানে যতদিন না কোনও দলের নেতৃত্বে জনপ্লাবন তৃণমূল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কলকাতার রাজপথে নামবে ততদিন এই সরকার টিকে থাকবে।**

যার জন্য বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের সৌজন্যে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড থেকে শুরু করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি এই ধরনের জিহাদি অনুপ্রবেশকারীর হস্তগত যা হয়তো এদেশের অধিকাংশ স্বাভাবিক ও প্রকৃত নাগরিকদের কাছে নেই। এই সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলগুলি একই কারণে সিএএ এবং এনআরসি-র বিরোধিতা করছে। এর ফলে পাকিস্তান, চীন তুলনামূলকভাবে ভারতের থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের ৩০ শতাংশ মুসলমানের অধিকাংশের চরিত্র বাংলাদেশের মুসলমানদের থেকে পৃথক নয়, শুধুমাত্র এরা সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। সুযোগ পেলেই এদের নগ্ন কুৎসিত রূপ যা বিশ্ববাসী ঢাকার বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে প্রত্যক্ষ করেছে, তা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও দেখতে পাবে।

পাকিস্তানের খানসেনারা যখন স্বজাতি বাংলাভাষী মুসলমানদের মা-বোনেদের বলাৎকার করেছে তখন ভারতবর্ষের হিন্দু সেনারা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করে তা মুজিবুরের হাতে তুলে দিয়েছিল। তখন কিন্তু চীনও পাশে এসে দাঁড়ায়নি। আজ উন্মাদ, বিকৃত রুচির বর্তমান প্রজন্ম আন্দোলনের নামে সেই ফার্সি, উর্দুভাষী তালিবান, পাকিস্তানি, রাজাকার ও চীনের হাতের তামাক খেয়ে মুজিবুরের মূর্তি ভাঙছে, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে হাসিনার অন্তর্বাস নিয়ে নাচানাচি করছে, সেলফি তুলছে আর স্লোগান দিচ্ছে 'বাংলা হবে আফগান, আমরা হবো তালিবান!' এই বর্বর, উন্মাদদের হাতে বাংলাদেশের ভবিতব্য! এরকম বর্বর, উন্মাদনা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও

গিজগিজ করছে আমার, আপনার চারপাশে। এরা যদি স্বজাতি 'হাসিনা আপার' প্রতি এই মনোভাব দেখাতে পারে তাহলে সুযোগ পেলে কালীঘাটের মন্দির তো ভাঙবেই, তার সঙ্গে এ রাজ্যের মা-বোনের কী হাল করবে কল্পনা করা কঠিন নয়। এই হিংস্র ধর্মান্ধরা গান্ধীজীকে পাত্তা দেয়নি। এরা এসব ভোট লোভী, সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী পাতি নেতাদের পিষে ফেলবে। দেশ ভাগের সময় যেমন বাচাল কংগ্রেসি নেতারা পাকিস্তানে হিন্দুদের হিংস্র শ্বাপদের মুখে ফেলে সপরিবার পালিয়ে এসেছিল, এরাও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বিপদের মুখে ফেলে ভারতের অন্যত্র সপরিবার পালিয়ে যাবে।

অর্থাৎ পাকিস্তানের বর্তমান প্রভু চীন পাকিস্তানি এজেন্ট বা জঙ্গি সংগঠনের মাধ্যমে ভারতে এই জিহাদি লালসা সম্পৃক্ত মুসলমানদের উসকে দেশজুড়ে হিংসা, দাঙ্গা, নাশকতা মানে কাশ্মীরের মতো হিন্দুদের বসবাসের পক্ষে অনুপযুক্ত উপদ্রুত অঞ্চল সৃষ্টি করতে পারে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা হবে সব থেকে ভয়াবহ। কারণ এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ যা অন্যসব রাজ্যের থেকে বেশি এবং এই কাজে চীন ও পাকিস্তান যে সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী আঞ্চলিক দলগুলির সাহায্য পাবে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ এই দলগুলি নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার মোহে এবং রাষ্ট্রবাদী দলকে পরাজিত করতে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তোষণ করছে এবং করবে। প্রাথমিকভাবে এদের ভোট পেয়ে এরা নির্বাচনে সফল হচ্ছে। ধর্মীয় কট্টরবাদীরা আঞ্চলিক দলগুলিকে ভোটে জিতিয়ে নিজেদের ভিত শক্ত করে সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণছে। যখন তারা পুরো দমে নিজেদের জিহাদি স্বরূপ তুলে ধরবে, তখন এই আঞ্চলিক দলের নেতা-নেত্রীরা লেজ গুটিয়ে পালাবে।

যেসব হিন্দু এই দলগুলোকে সমর্থন করছে তারা নিজেরাও বিপদে পড়বে এবং যারা সঠিক অবস্থা বুঝে এই আঞ্চলিক দলগুলিকে সমর্থন করছে তারা নিজেরাও বিপদে পড়বে এবং যারা সমর্থন করছে না তারা তো এখনই বিপদের মধ্যে আছে। বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুদের ওপর জিহাদের নামে অত্যাচার করা যায় পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে সেটা হয়তো এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাই জিহাদিরা এই সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোট দিয়ে (পশ্চিমবঙ্গে আগে বামফ্রন্ট, এখন তৃণমূল) তাদের সমর্থক রূপে সেই দলের পতাকা নিয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষের নামে রাষ্ট্রবাদী, হিন্দুত্ববাদী দলকে ভোট না দিয়ে তাদের ওপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে। স্বার্থান্বেষী দলগুলো 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে' মনোভাব নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে তা উপভোগ করছে। সংবাদ মাধ্যমে কিছু ঘটনা রাজনৈতিক সংঘর্ষ রূপে পরিবেশিত হচ্ছে কিন্তু আসলে এগুলি জিহাদি আক্রমণ।

দুঃখের বিষয়, ভারত কিন্তু চাইলেও চীন বা পাকিস্তানে এ ধরনের অভ্যন্তরীণ নাশকতা, সন্ত্রাস বা উপদ্রব সৃষ্টি করতে পারবে না, কারণ ভারতের অঙ্গুলিহেলনে চলবে এ ধরনের কোনো জনগোষ্ঠী পাকিস্তান ও চীনে নেই। তিব্বতি বৌদ্ধরা কিন্তু এ ধরনের নাশকতা উপদ্রব সৃষ্টি করে চীনকে বিব্রত করার পক্ষপাতী নয়। তাই অ্যাডভান্টেজ পাকিস্তান ও চীনের। ভারত স্বাধীনতার পর থেকে এই অসুবিধা ভোগ করে আসছে।

এমতাবস্থায় মন্দের ভালো বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে অনেকটাই ইতিবাচক ছিল। বার বার আশ্রয় দেওয়া, প্রাণ বাঁচানোর ফলে ভারতের প্রতি শেখ হাসিনার একটা স্বাভাবিক নৈকট্য ছিল। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল যার ফলে দ্রুত চীন সীমান্তে সেনা ও সামরিক রসদ পরিবহণ সম্ভব হবে, প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ইত্যাদি সম্পর্কিত চুক্তি ভারতকে অনেকটাই সুবিধা দিয়েছিল। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা কতটা বজায় থাকবে এখন সেটাই দেখার। এর সঙ্গে যুক্ত হলো হিন্দুদের নিরাপত্তা।

সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে মুজিবরের মূর্তি ভাঙা প্রমাণ করছে বাংলাদেশ হয়তো পাকিস্তানের রূপ ধারণ করতে চলেছে। সেনাবাহিনী যদি ধর্মীয় কট্টরবাদকে প্রশ্রয় না দিত তবে তারা অবশ্যই মুজিবের মূর্তি, বঙ্গবন্ধু সংগ্রহশালা ইত্যাদি রক্ষা করতো। সম্ভবত তালিবানদের বুদ্ধমূর্তি ভাঙার মতো বাংলাদেশে কট্টরবাদী জামাত, রাজাকাররা অতীতের কোনো চিহ্নই রাখতে চায় না। ছাত্ররা এটাকে বলছে 'নতুন স্বাধীনতা আন্দোলন'। প্রকৃতপক্ষে কট্টরবাদী জামাত বাংলাদেশের সৃষ্টির ইতিহাসকেই ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে চাইছে। সেনা ও জামাতের যোগসাজশে হাসিনাকে দেশছাড়া করা হয়েছে। তাদের হাতেই এখন বাংলাদেশের রাশ। যে অভিযোগে শেখ হাসিনা আজ দেশছাড়া সেই একই অভিযোগ অর্থাৎ দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার, পারিবারিক একনায়কতন্ত্র ইত্যাদির জন্য খালেদা জিয়াকেও ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল। তার বিরুদ্ধেও ভুরিভুরি দুর্নীতির অভিযোগে মামলা চলছে। তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। সবকিছুই যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত তা নয়, এর মধ্যে সত্যতা আছে। কট্টরবাদী জামাতকে দুদিন আগে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাতারাতি খালেদা জিয়া কারাগার থেকে মুক্ত, জামাতের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। সবকিছু যেন এক সুতোয় বাঁধা।

খালেদার পুত্র তারেক নাকি দেশে ফিরে এসেছে। ছাত্ররা এখন কেন বলছে না যে জামাতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রাখতে হবে। ছাত্ররা কেন বলছে না খালেদার কুপুত্র তারেককে বাংলাদেশে ফেরানো যাবে না। ছাত্ররা অবশেষে আঙ্গুল চুষবে। তাদের হাতে যদি আন্দোলনের রাশ থাকতো তবে গণভবনে মুজিবুরের মূর্তি ভাঙা এবং ওই কুৎসিত অশ্লীলতাকে তারা ঠেকাতে পারতো। বাংলাদেশ সর্বোচ্চ আদালত কোটা বিরোধী রায় দেওয়ায় ছাত্র আন্দোলন ওখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ ছাত্ররা দেখল একদিন সকালে ঢাকায় লং মার্চের ডাক দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে উসকে দিয়ে জামাত-বিএনপি জল মেপেছে, হাসিনার শক্তি যাচাই করেছে, যখন দেখেছে পরিস্থিতি অনুকূল তখনই তারা সেনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসিনার ঘটি উলটেছে। এই সেনাপ্রধানও হয়তো হাসিনাকে পিছন থেকে ছুরি মেরে অবসরের পর রাষ্ট্রপতি হওয়ার তালে আছে। অর্থাৎ ছাত্রদের হাতে কিছু নেই। বিএনপি-জামাত আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলির সমর্থন পাওয়ার জন্য মূলত ক্ষমতাহীন ভদ্রলোককে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রূপে সামনে রাখবে।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক হয়তো কিছুটা অন্ধকারে ছিল। যেহেতু হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তাই তাকে কিছু পরামর্শ দেওয়াই যেত। আওয়ামি লিগের নীচের তলা দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল। দল সাধারণ

মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বিদেশে টাকা পাচার, দিনের পর দিন নির্বাচন না হওয়া, আমলা-পুলিশ এবং সুবিধাভোগী দালাল পরিবেষ্টিত হয়ে সরকার চালানো যে বাঞ্ছনীয় নয় সেটা হাসিনাকে বোঝাতে হতো। দল ও সরকারের ভাবমূর্তি উদ্ধারের জন্য কিছু ইতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রকৃত নির্বাচনের সম্মুখীন হয়ে বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করে ক্ষমতায় থাকার পরামর্শ হাসিনাকে সময় থাকতে অবশ্যই দেওয়া উচিত ছিল। সম্পূর্ণ বাংলাদেশে জনপ্রিয় পরবর্তী আওয়ামি লিগ নেতৃত্ব গড়ে তোলার ব্যাপারেও হাসিনাকে সচেষ্ট হওয়ার পরামর্শ দিতে হতো। এমনিতেই হাসিনার বয়স হয়েছে। ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন প্রজন্মের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি সম্পন্ন নেতৃত্বের হাতে সরকারের দায়িত্ব অর্পণ করে হাসিনাকে সম্মানের সঙ্গে সরে যেতে বলতে হতো। হাসিনা না শুনলে হাসিনার বিকল্প, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী এমন নেতৃত্বকে সুকৌশলে সামনে নিয়ে আসতে হতো। কারণ ভারতের কাছে ব্যক্তির কোনও গুরুত্ব নেই। ভূ-রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশকে কতটা সম্পর্কের মধ্যে রাখা যাবে সেটাই মুখ্য। হাসিনার দুর্বুদ্ধির জন্য তিনি তো ক্ষমতাচ্যুত হলেনই, তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ও কট্টরবাদী জামাত-বিএনপি-রাজাকারদের খপ্পরে পড়ল। এখন হাসিনার আশ্রয় ভারতের কাছে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ঝুঁকি। রাজনীতি থেকে অবসর নিতে আগ্রহী ৭৮ বছরের হাসিনা বাতিল ঘোড়া। তাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের রোষের কারণ হয়ে কী লাভ!

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পালাবদল ভারতের কাছে একটা শিক্ষা। বাংলাদেশ ভারতের অঙ্গরাজ্য না হয়ে পৃথক দেশ হওয়ায় সেখানে নির্বাচন না করে, নির্বাচনের নামে প্রহসন করে দিনের পর দিন ক্ষমতায় থাকার প্রবণতা দেখা যায়। বিএনপি, এরশাদ বা হাসিনার আমলে সবই এক ছবি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অদ্ভুত মিল। পশ্চিমবঙ্গ পৃথক দেশ না হয়ে ভারতের অঙ্গরাজ্য হওয়ায় হয়তো এতটা করা যায় না। কিন্তু এখানেও বাম থেকে তৃণমূল আমল— লোকসভা নির্বাচনটা মোটামুটি হয়, কিন্তু বিধানসভা, পৌরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই প্রহসনে পর্যবসিত। নির্বাচনের আগে বাড়ি বাড়ি সাদা থান পাঠিয়ে দেওয়া, নির্বাচনের পর বিরোধীদের গ্রাম ছাড়া, পাড়া ছাড়া করা; ক্ষেতের ফসল লুঠ, পুকুরের মাছ লুঠ; মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, গাঁজা কেস দেওয়া, ঘরবাড়ি জ্বালানো এবং সর্বশেষে ধর্ষণ, খুন-হিংস্রতার কোনও কিছুই বাকি থাকে না।

জিহাদিরা যেমন বলে শুধু তারাই থাকবে বাকিরা শত্রু, অতএব হত্যার যোগ্য, পশ্চিমবঙ্গেও রাজনৈতিক বিরোধীদের ধনে-মানে শেষ করে দেওয়া যাতে শাসক পক্ষ চিরকাল ক্ষমতায় থাকতে পারে। কমিউনিস্ট থেকে তৃণমূল— এই সেমিটিক বা রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতার ভাবনায় জারিত হওয়ার কারণে তারা মানসিকভাবে জিহাদিদের এত কাছাকাছি। এরা প্রত্যেকেই আসুরিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন। বাংলাদেশেও কেউ চিরকাল ক্ষমতায় থাকতে পারেনি।

এরশাদের বিরুদ্ধে হাসিনা ও খালেদা যৌথভাবে রাজপথে জনজোয়ার ঘটিয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। আবার হাসিনা ঢাকার রাজপথে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের জনপ্লাবনের ধাক্কায় খালেদাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। কালের কী অমোঘলীলা! হাসিনার পাপের ঘড়া পূর্ণ হওয়ায় ঢাকার রাজপথে সেই জনপ্লাবনের ধাক্কায় তাঁকে দেশ ছাড়তে হলো।

কালের অমোঘ বিধানে যতদিন না কোনও দলের নেতৃত্বে জনপ্লাবন তৃণমূল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কলকাতার রাজপথে নামবে ততদিন এই সরকার টিকে থাকবে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিবৃতি

বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের দাবিতে বিগত কয়েকদিন ধরে আন্দোলন চলাকালীন সেদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর সহিংস আক্রমণের ঘটনায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে নৃশংসভাবে হত্যা, লুটপাট, এবং ঘরবাড়ি-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ, হিন্দু মহিলাদের সম্ভ্রমহানি এবং মন্দিরের মতো পবিত্রস্থানে হামলার ঘটনাসমূহ অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই জঘন্য ও অমানবিক ঘটনাগুলির তীব্র নিন্দা করছে।

আশা করা যায় যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার অবিলম্বে এ ধরনের ঘটনা বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সেদেশের সরকার এইসব ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বিশ্ব এবং ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা যেন একজোট হয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান।

বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে একটি প্রতিবেশী ও মিত্রদেশ হিসেবে ভারত তার যথাযথ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ-সহ অন্যান্য নিপীড়িত মানুষদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে ভারত সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছে।

দত্তাত্রেয় হোসবালে
সরকার্যবাহ
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

(৯ আগস্ট, ২০২৪)

অনুরাগের ছোঁয়া : ইট মারলে পাটকেল তো খেতেই হবে

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠি

ধরুন কেউ আপনাকে প্রশ্ন করলো আপনার জাত কী? প্রথমে আপনি একটু ইতস্তত বোধ করলেও আপনি আপনার জাত কী তার উত্তর দিতেই পারেন। কিন্তু তারপর যদি তাকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন— আপনি আমার জাত নিয়ে প্রশ্ন করছেন, আপনার নিজের জাত কী, তবে কি তাকে ভীষণ অপমান করা হবে? তার কি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে বলা উচিত হবে যে আপনি তাকে ইনসাল্ট করছেন? যে অন্যের জাত নিয়ে প্রশ্ন করে, তাকে তার জাত জিজ্ঞেস করা কি কোনো অপরাধ?

সম্প্রতি এমনই এক অদ্ভুত কাণ্ডের সাক্ষী থাকলো সারা দেশ। গত চার-পাঁচ বছর ধরে ক্ষমতায় ফিরতে পাগল, তিন-তিনটি নির্বাচনে কংগ্রেসের ব্যর্থ সেনাপতি এবারের নির্বাচনে মাত্র ৯৯টি আসন জিতে এখন বিরোধী দলনেতা হয়েছেন। তিনি সেদিন বাজেট অধিবেশনের জবাবি ভাষণে এত বছরের প্রথা ভেঙে তার ভাষণের অভিমুখই ঘুরিয়ে দিলেন জাতপাত আর জাতিভিত্তিক জনগণনার দিকে। তিনি লোকসভায় যখন এই নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলেন, তারপরে পূর্বতন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন তারই ছোঁড়া একটি প্রশ্নবাণ। বললেন আপনি সকলের জাত খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আপনার জাত কী? যার নিজের জাতের ঠিক নেই, তিনি জাত জানতে চাইছেন? ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ঘি পড়লো! 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' অখিলেশ চিৎকার শুরু করে দিলো— আপনি রাহুলের জাত কেন জানতে চাইবেন? আপনার কী অধিকার আছে রাহুলের জাত জিজ্ঞেস করার? ইত্যাদি, ইত্যাদি. . .. ইন্ডিজোটে নেতার চেয়ে অবশ্য চামচার কদর বেশি। লোকসভায় শুরু হলো তুমুল হট্টগোল।

কিন্তু অনুরাগ ঠাকুর কি ভুল বলেছেন? ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে রাহুল-অখিলেশ-তেজস্বীর ১৪০ কোটি জনগণের জাত জানতে চাওয়ার দাবি যদি ইনসাল্ট না হয়, তবে রাহুলের জাত কী এটা জানতে চাওয়া গালাগালি কেন হবে? নির্বাচন চলাকালীন রাহুল বলেছিলেন— 'নরেন্দ্র মোদী দলিত বিরোধী। এসসি-এসটি- ওবিসিদের সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত করছেন। মোদী বলুক লোকসভার কার্যালয়ে চাকুরিরতদের কত শতাংশ দলিত, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কত শতাংশ অনুসূচিত জাতির, অর্থমন্ত্রকে কর্মরত অফিসারদের কত শতাংশ পিছড়ে বর্গ, সেনাবাহিনীর মধ্যে কত শতাংশ এসসি-এসটি-ওবিসি?' অর্থাৎ, সকলের' জাত জানতে চাওয়া তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। আর কেউ যদি একটিবারও তার জাত জানতে চায় তবে প্রলয় ঘটে যাবে!

আপনারাই বলুন, রাহুলের জাত জানতে চাওয়া যদি ইনসাল্টই হয় তবে দেশে জাতগণনা কী করে হবে? জাতগণনা করতে গেলে তো মানুষকে তার জাত জিজ্ঞেস করতেই হবে। ১৪০ কোটিকে তাদের জাত জিজ্ঞেস করা যদি ন্যায়বিচার হয়, তবে রাহুলের জাত জিজ্ঞেস করা অবিচার কীসে? 'ভারত ন্যায় যাত্রা'র সময় রাহুল যখন সাংবাদিক, পুলিশ অফিসারদের ডেকে ডেকে জাত জানতে চাইছিলেন, তখন অসুবিধা হয়নি, কিন্তু যেই কেউ তার জাত নিয়ে প্রশ্ন করলো অমনি অসম্মান করা হয়ে গেল? রাহুল প্রশ্ন করলে সামাজিক ন্যায়, আর অনুরাগ প্রশ্ন করলে অবমাননা— এ কোন থার্মোমিটার?

> **জাতিভিত্তিক জনগণনা করতে চাওয়া রাহুলের পূর্বপুরুষদের এবিষয়ে অবস্থান কি ছিল? রাহুল কি জানেন— ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, অর্থাৎ রাহুলের বাবার দাদু, জওহরলাল নেহরু ১৯৫১ সালে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে জাতিভিত্তিক জনগণনা রুখে দিয়েছিলেন?**

রাহুলের জানা নেই, তিনি হয়তো স্কুলের গণ্ডীটাও পেরোননি, অথবা যে সময় এ দেশের রাজনীতিতে জাতপাতের নামগন্ধ পর্যন্ত ছিল না, সেই ১৯৮৪ সালে বিজেপি কল্যাণ সিংহ নামে এক দলিত নেতাকে উত্তরপ্রদেশের সভাপতি মনোনীত করেছিল। তার কাছে এ খবরও নেই যে ১৯৮৯ সালে অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাস করেছিলেন কামেশ্বর চৌপাল নামে এক মহাদলিত। এদেশে মণ্ডল কমিশন আসার বহু পূর্বে বিজেপি বিনয় কাটিয়ার, উমা ভারতীদের মতো দলিতদের সর্বভারতীয় দায়িত্ব দিয়েছিল, বঙ্গারু লক্ষ্মণের মতো একজন দক্ষিণ ভারতীয় এসটি নেতাকে তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত করেছিল। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে বিজেপির অসংখ্য প্রদেশ সভাপতি ছিলেন দলিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। উমা ভারতী, বাবুলাল গৌড়, শিবরাজ সিংহ চৌহান, মোহন যাদব, কল্যাণ সিংহ, কেশবপ্রসাদ মৌর্য, সুশীল মোদী, তারকিশোর প্রসাদ, রেণু দেবী, সম্রাট চৌধুরীদের মতো দলিত-মহাদলিত নেতা তাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-উপমুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। বিজেপি নরেন্দ্র মোদীর মতো দলিত নেতাকে প্রধানমন্ত্রী প্রোজেক্ট করেছে, রামনাথ কোবিন্দ, দ্রৌপদী মুর্মুর মতো দলিত ও

জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত নেতা-নেত্রীদের রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত ও নির্বাচিত করেছে। এগুলো করতে তাদের কোনো জাতিগত জনগণনা করতে হয়নি।

রাহুল বরং একটু তথ্য দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিক যে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত ৬০ বছরের কংগ্রেস জমানায় কতজন দলিতকে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি করেছে, কতজন অতিদলিতকে রাজ্য সভাপতি করেছে, কতজন পিছড়েবর্গকে মুখ্যমন্ত্রী-উপমুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে? এমনকী ২০০৪ থেকে ২০১৪— এই ১০ বছরে মনমোহন সিংহ মন্ত্রীসভায় ক'জন এসসি-এসটি-ওবিসির প্রতিনিধিত্ব ছিল? তিনি আরও বলুন যে আজকের দিনে রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনে, নেহরু মেমোরিয়ালে, লালবাহাদুর শাস্ত্রী ফাউন্ডেশনে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কতজন এসসি-এসটি- ওবিসি প্রতিনিধিত্ব করেছেন? রাহুলের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষেরা ষাট বছরে ক্ষমতায় থেকে যেখানে একজন দলিতকেও দেশের প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি বানাতে পারল না, সেই পরিবারের বংশজ সেই রাহুল বলছে কিনা বিজেপি দলিত বিরোধী!

আচ্ছা জাতিভিত্তিক এই জনগণনা করতে চাওয়া রাহুলের পূর্বপুরুষদের এবিষয়ে অবস্থান কি ছিল? রাহুল কি জানেন— ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, অর্থাৎ রাহুলের বাবার দাদু, জওহরলাল নেহরু ১৯৫১ সালে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে জাতিভিত্তিক জনগণনা রুখে দিয়েছিলেন? তাঁর কি মনে আছে যে তাঁরই ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধী এই জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলেছিলেন— 'না জাত পে, না পাত পে, মোহর লাগেগী হাত পে'? তিনি কি ভুলে গেলেন যে এই সেদিন তাঁর পিতা রাজীব গান্ধী মণ্ডল কমিশনের জাতপাত ভিত্তিক সংরক্ষণের বিরোধিতা করে বলেছিলেন— 'হামকো বুদ্ধুয়োঁ কা দেশ নেহি বানানা হ্যায়'? অর্থাৎ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ভাষায় এসসি-এসটি- ওবিসিরা হলেন মূর্খ সম্প্রদায়। আজ রাহুল শুধু একবার বলে দিন— আমার বাপ, ঠাকুমা, ঠাকুমার বাবা সকলেই ভুল করেছিলেন। তাদের চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্ম সবটাই ভুল ছিল। তারা যদি ভুল করেই থাকেন এবং জাতপাতের ভিত্তিতেই যদি এদেশের সব কিছুর অধিকার দেওয়া উচিত বলে রাহুল মনে করেন তবে তিনি আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা আজ একবার বলে দিন যে দেশের সব প্রতিষ্ঠানে জাতভিত্তিক সংরক্ষণ চাই। তা সে জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক বা আলিগড় ইউনিভার্সিটি— রাহুল বলুন যে তারা ভারতের সমস্ত জায়গায় এসসি- এসটি-ওবিসি রিজার্ভেশনের পক্ষে।

অনুরাগ ঠাকুর তো যথার্থই বলেছেন যে রাহুল জাতপাত নিয়ে এত লম্ফঝম্প করছেন, তার নিজের জাতের বায়োডাটাটা কি? জাত তো হিন্দুর হয়, মুসলমানের- খ্রিস্টানের তো হয় না। আসলে অনুরাগ ঠাকুর রাহুলের জাত জিজ্ঞাসা করে তার জন্মকুণ্ডলী ধরে টান দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে রাহুল না মাতৃকূলে হিন্দু, না পিতৃকূলে হিন্দু। রাহুলের দাদু অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী মোহাম্মদ ফিরোজ খান ছিলেন মোহাম্মদ নবাব খানের পুত্র। এদেশের সংস্কৃতি হলো বিয়ের পরে স্ত্রীরা স্বামীর পদবী গ্রহণ করে। কিন্তু হিন্দুদের ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পরামর্শে তিনি এফিডেফিট করে 'খান' থেকে 'গান্ধী' হয়ে যান। তারই পুত্র রাজীব হলেন রাহুলের পিতৃদেব। এই হলো তার পিতৃকূলের পরিচয়। আর মাতৃকূলের? সেখানেও অদ্ভুত ব্যাপার! রাহুলের মা হলেন ইতালির লুসিয়ানা শহরের স্টেপনো মাইনো ও পাওলা মাইনোর কন্যা— অ্যান্তোনিয়া মাইনো (সোনিয়া গান্ধী), যা আদতে এক খ্রিস্টান রোমান ক্যাথলিক পরিবার। তাই, না পিতার রক্তে, না মাতার রক্তে রাহুল হিন্দু বংশোদ্ভূত।

আচ্ছা আপনাদের নটবর সিংহকে মনে আছে? রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা, যিনি জওহরলাল নেহরুর সময় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে কর্মরত ছিলেন, পরে ইন্দিরা মন্ত্রীসভায় বিদেশমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে পিভি নরসিমারাও মন্ত্রীসভার মন্ত্রীও হয়েছিলেন। সেই নটবর সিংহের কথাই বলছি। রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি একখানি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম— 'ওয়ান লাইফ ইজ নট এনাফ'। সে বইয়ের ১৪৪ পৃষ্ঠায় তার জীবনের একটি অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। তিনি লিখছেন— ''১৯৬৯ সাল। ইন্দিরা গান্ধী তখন আফগানিস্তান সফরে। আমি তার সফর সঙ্গী। একদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাকে নিয়ে কাবুল থেকে ১০-১২ মাইল দূরে একটি প্রায় পরিত্যক্ত জায়গায় উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি উঁচু ঢিবি দেখে গাড়ি দাঁড় করালেন। অফিসারদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন— এটা কী? এক নিরাপত্তা অফিসার বললেন এ হলো 'বাগ-এ-বাবর', অর্থাৎ বাবরের কবরস্থান। ধীর পায়ে গাড়ি থেকে নামলেন তিনি। গেলেন সেই মাজারের পাশে। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলেন সেখানে। পিছনে আমি দাঁড়িয়ে। পরে যখন জিজ্ঞেস করলাম, ম্যাডাম, বাবরের মাজারে এসে কাকে, কী জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন? ইন্দিরাজী উত্তর দিয়েছিলেন— আমি ইতিহাসকে স্মরণ করতে এসেছি''। যে বাবর এদেশে অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির-সহ শতশত মন্দির ধ্বংস করেছে, মা-বোনেদের সতীত্ব নষ্ট করেছে, হিন্দুর রক্তে হোলি খেলেছে— সেই বাবরের মাজারে এসে যার ঠাকুমা নতমস্তকে ইতিহাস স্মরণ করেন, তার জাত কী— সেই প্রশ্ন এদেশের মানুষের জানতে চাওয়া কি ভুল? আর জানতে চাইলেই তা অপরাধ হয়ে যাবে?

যে বংশের ইতিহাস-স্মরণ শুরু হয় বাবরের সমাধিতে সম্মান জানিয়ে, তাঁর নাতি হিন্দু ধর্মকে জাত-পাতে ভেঙে টুকরো টুকরো করবে না তো কি হিন্দু ধর্মের জয়গান গাইবে? বিরোধীরা গত ১০ বছর ধরে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে সরাবার সব রকমের চেষ্টা করে দেখে নিয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে শূন্য। ২০২৪-এ তাদের যতটুকু সাফল্য এসেছে, তা এই হিন্দু ভোট বিভক্ত করে, আর ভাতা-ভিক্ষার লোভ দেখিয়ে। ইন্ডিজোট জানে, মুসলিম ভোট জোটবদ্ধ। তা তাদের করায়ত্ত, কিন্তু যথেষ্ট নয়। হিন্দু ভোট যতদিন না খণ্ড খণ্ড করে ভাঙা যাচ্ছে, ততদিন ক্ষমতা দখল অসম্ভব। তাই হিন্দুসমাজকে জাতপাতে ভেঙে দেওয়াই ক্ষমতা দখলের একমাত্র পথ। সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে তাতে শান দেওয়া শুরু করেছে রাহুল-অখিলেশরা। কিন্তু অনুরাগ ঠাকুরের প্রশ্ন তাদের একটু বেকায়দায় ফেলে দিল বই কী! ইট মারলে পাটকেল যে খেতে হয়— এই বোধ রাহুল-অখিলেশদের থাকা উচিত। না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে তাদের। □

ধারাবাহিক হিংসাত্মক নগ্ন অভ্যুত্থানের সাক্ষী থেকেছে বাংলাদেশ

জয়দীপ রায়

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত ভেঙে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান। তার পর থেকে কার্যত সেনার হাতেই ক্ষমতা ছিল পাকিস্তানের। পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তান ভেঙে জন্ম হয় বাংলাদেশের। তারপর থেকেই ধারাবাহিকভাবে সেনা ও গণঅভ্যুত্থানের সাক্ষী থেকেছে বাংলাদেশ। সেখানকার গণতন্ত্র কোনও দিনও মসৃণ ছিল না। সেই একই ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় মুজিবুর রহমানের আওয়ামি লিগ। ১৬২ টি আসনের মধ্যে ১৬০ টি আসন দখল করে তারা। অন্যদিকে জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপিপি পূর্ব পাকিস্তানের ১৩৮ টি আসনের মধ্যে ৮১ টি আসনে জয়ী হয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামের আহ্বান জানান। যার জেরে পাকিস্তানির সেনাবাহিনী বিক্ষোভ দমন করতে কুখ্যাত অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। এই অপারেশনের কারণে সেই সময় বাংলাদেশ জুড়ে চলে ব্যাপক হত্যালীলা, অগ্নি সংযোগ, ধর্ষণ ও অবৈধ গ্রেফতারের ঘটনা।

এই ঘটনার নেপথ্য কারণ হলো, তৎকালীন পাকিস্তান সেনা প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ছিল ক্ষমতা। তিনি আওয়ামি লিগ তথা মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে অস্বীকার করেন। যা নিয়ে অস্থিরতা তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তানে। আগে থেকেই উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল সেখানে। তার মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়ার কারণে অস্থিরতা অগ্নিগর্ভ আকার ধারণ করে। যার জেরে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালি সেনা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার পরে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের প্রতি সরাসরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী গঠন করতে সব রকম সাহায্য করেন। এর পরবর্তী অধ্যায় অজানা নয়। তৈরি হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা যোগ দেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে।

স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন হওয়ার পর একাধিক অভ্যুত্থানের সাক্ষী থেকেছে বাংলাদেশ। স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে বাংলাদেশ প্রথম সেনা অভ্যুত্থান হয়। যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান, মেজর খন্দকার আবদুর রসিদ এবং রাজনীতিবিদ খন্দকার মোস্তাক আহমেদ। সেই সময় কিছু সেনা আধিকারিক শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর স্ত্রী-সহ পরিবারের মোট ১৮ জন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করে। সেই সময় শেখ হাসিনা এবং তাঁর বোন শেখ রেহানা ছিলেন বিদেশে। পরবর্তী সময় নতুন শাসন ব্যবস্থায় খন্দকার মোস্তাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি হন। সেনাপ্রধান হন জিয়াউর রহমান।

খন্দকার মোস্তাকের শাসনকালও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ফের সেনা অভ্যুত্থান ঘটে বাংলাদেশে। সেই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন মুজিবুরের ঘনিষ্ঠ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ। তিনি নিজেকে নতুন সেনাপ্রধান হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু মোশারফও ছিলেন ক্ষণিকের অতিথি।

তাঁর শাসনকাল টিকে ছিল মাত্র চার দিনের জন্য। যদিও এই পট পরিবর্তন কোনো সেনা অভ্যুত্থানের জন্য হয়নি। পরবর্তীতে মোশারফের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতি হন জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি বা বাংলাদেশ ন্যাশানাল পার্টি (বিএনপি) ১৯৭৮ সালে সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে। কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮১ সালে মেজর মঞ্জুরের নেতৃত্বে একটি সেনা ইউনিট জিয়াউরকে সরিয়ে দেয়। পরবর্তী ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনাপ্রধান মহম্মদ হুসেন রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের শাসনভার দখল করেন। তিনি সংবিধান স্থগিত করে সামরিক আইন জারি করেন।

১৯৮৬ সালে এরশাদ জাতীয়পার্টি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৯৮২ সালের অভ্যুত্থানের পরে বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অনুমতি দেন। সেই নির্বাচনে এরশাদের জাতীয়পার্টি সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে থাকেন এরশাদ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রপন্থীদের বিক্ষোভের চাপে পড়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। ১৯৯১ সালের পর থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরে এলেও বিভিন্ন সময় গণতন্ত্রের ওপর সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এরপর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে চললেও ফের ছন্দপতন ঘটে ২০০৭ সালে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি-জামাত সরকার। কিন্তু সেই সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই ফের অশান্তির কালো ছায়া নেমে আসে বাংলাদেশের বুকে। হিংসাত্মক ঘটনা ছড়িয়ে অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি হয়। ফের অতীতের স্মৃতি ফিরিয়ে সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনার সাক্ষী থাকতে হয় বাংলাদেশকে। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেই সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেয় লেফটেন্যান্ট জেনারেল মইনুদ্দিন আহমেদ। এর ঠিক একবছর বাদে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে ক্ষমতায় আসেন মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা। অবসান ঘটে সামরিক শাসন ব্যবস্থার। গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশের শাসনভার পরিচালনার পর পুনরায় হিংসাত্মক গণঅভ্যুত্থানের জেরে ভারতে পালিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন শেখ হাসিনা। শুরু হয় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার। □

বৈভবশালী ভারত গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

মন্দার গোস্বামী

বাতাসে পতপত করে উড়ছে গৈরিক পতাকা। পতাকা তলে সমবেত একদল বালক, শিশু, অথবা যুবক, প্রৌঢ়। বয়স যাই হোক না কেন, সকলেই সুশৃঙ্খলভাবে শারীরিক অনুশীলনরত। খেলাধুলা, শরীর চর্চার পর সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান, সুভাষিত পাঠ, বৌদ্ধিক অনুশীলন। তারপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা— 'নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে...'। গৈরিক পতাকা তলে ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করবার প্রতিজ্ঞা। তারপর 'ভারতমাতা কী জয়'... জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে ঘণ্টাখানেকের কার্যক্রমের সমাপ্তি। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই এ এক অতি সুপরিচিত দৃশ্য। কখনও সকালে, কখনও বিকালে, রাত্রিতে অথবা যে কোনো সুবিধা মতো সময়ে শাখা অথবা মিলনে চলে এই অনুশীলন। হ্যাঁ এঁরাই বিশ্বের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক। স্বয়ংসেবক অর্থাৎ রাষ্ট্র নির্মাণে স্ব-ইচ্ছায় আগত সেবক।

ভগিনী নিবেদিতা একবার বলেছিলেন যদি হিন্দুরা মাত্র ৫ মিনিটের জন্য একত্রিত হয় তাহলে অজেয় শক্তি নির্মাণ হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'আগামী ৫০ বছর ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হউন'। তিনি দেশকে ইট কাঠ মৃত্তিকা জ্ঞান করতেন না। ভারতমাতা রূপে কল্পনা করতেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আনন্দমঠে ভারতমাতার বর্ণনা দিলেন। তিনি পরাধীন জাতিকে আনন্দমঠের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। এই চিন্তা-ভাবনা বক্তব্যগুলিকেই পাথেয় করে ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিন নাগপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশববলিরাম হেডগেওয়ার। নবম শ্রেণীতে পড়বার সময় যিনি বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে পরবর্তীকালে কলকাতায় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। ডাক্তারি পড়া থেকেও আসল উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের পীঠস্থান বঙ্গে বিপ্লবী কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। তিনি বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন।

তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, আমরা বারবার কেন পরাধীন হয়েছি? কেন আমাদের মাতৃভূমি বারবার খণ্ডিত হয়েছে? স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণে তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছে। জেলে বিশিষ্ট মানুষদের সম্পর্কে এসে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশের তৈরি মেকলীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত এদেশের মানুষকে প্রথমে দেশাত্মবোধে দীক্ষিত করতে হবে। চাই অনুশাসন, চাই ভ্রাতৃত্ববোধ, চাই জাতীয়তাবোধ। ইসলামিক শাসনে কয়েকশো বছরের পরাধীনতা, দাসত্ব বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী ভারতীয়দের আত্মবিস্মৃত করে তুলেছে। আমরা অসংখ্য জাতপাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। বীরত্বের অভাবে নয়, অনৈক্যের কারণেই আমরা বারবার পরাজিত হয়েছি। আজ ইংরেজ আছে, কাল অন্য কোনও শক্তি এসে আমাদের শাসন করবে। তাই ঐক্যবদ্ধ দেশ নির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে, উপযুক্ত ব্যক্তি নির্মাণের লক্ষ্যে মাত্র পাঁচ-ছ'জনকে নিয়ে শুরু করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। পাশ করা ডাক্তার হয়েও মানব-ব্যাধি নয়, সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ে ব্রতী হলেন। শুরুতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হলেও ধীরে ধীরে সঙ্ঘের চিন্তাভাবনা আদর্শ ভারতবর্ষ জুড়ে প্রসারিত হলো।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে দলে দলে যুবকরা এসে যোগ দিল এই সংগঠনে। ইংরেজরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকলাপ সন্দেহের চোখে দেখত। তখনকার গোপন সরকারি ফাইলেই এর উল্লেখ রয়েছে। সঙ্ঘে জাতপাতের কোনও বালাই ছিল না। ১৯৩৪ সালে একবার গান্ধীজী সঙ্ঘের ওয়ার্ধা ক্যাম্পে এসে নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন সঙ্ঘে অস্পৃশ্যতার কোনও স্থান নেই। তাই তিনি ডাক্তারজীকে বলেছিলেন— আমি জানতাম আমি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একাই অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন করছি, আজ জানলাম ভারতবর্ষে আরও একজন আছেন তার নাম ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। সুভাষচন্দ্র বসুও সঙ্ঘের কঠোর শৃঙ্খলায়

প্রভাবিত হয়েছিলেন। কংগ্রেস করবার কারণে উভয়েই পরিচিত ছিলেন। সাংগঠনিক কিছু আলোচনাও হয়েছিল। কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে ১৯৪০ সালের ২০ জুন ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু ডাক্তারজী তখন মৃত্যু শয্যায়। অসুস্থতার জন্য কোনও কথা বলতে পারেননি। পরের দিনই ২১ জুন ডাক্তারজীর মৃত্যু হয়। সঙ্ঘ সম্পর্কে সমাজে কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে। কেউ ভাবে সঙ্ঘ একটি ভালো সেবা প্রতিষ্ঠান। কেউ ভাবে এটি একটি প্যারামিলিটারি অর্গানাইজেশন। কেউ ভাবে সঙ্ঘ আসলে শরীর চর্চার আখড়া। আবার সঙ্ঘ থেকে অনেকে রাজনীতিতে গিয়েছেন, তাই অনেকেই ভাবেন সঙ্ঘ আসলে একটি রাজনৈতিক সংগঠন। বাস্তবে সঙ্ঘের সঙ্গে তুলনা করবার মতো কিছু না থাকায় সঙ্ঘ দর্শন অন্ধের হস্তি দর্শনের মতোই অসম্পূর্ণ। সঙ্ঘ প্রচারে বিশ্বাস করে না, নিশ্চুপে দেশ জাগরণের কাজ করে। সঙ্গে আছে আরও অনেক সঙ্ঘ মনোভাবাপন্ন সহযোগী সংগঠন। সকলেই রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ করে চলেছে।

স্বাধীনতার আগে যেমন অসংখ্য স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে কারাবাস করেছে, স্বাধীনতার পরও দেশের বিপদে আপদে সঙ্ঘই সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার পর পরই কাশ্মীর দখলের উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তান আমাদের আক্রমণ করে। একটা সময় পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, ভারতীয় ফৌজ পৌঁছানোর আগেই পাকিস্তান কাশ্মীর দখল করে নেবে। এমত অবস্থায় একটিই রাস্তা ছিল বিমানে সৈন্য প্রেরণ। অথচ সৈন্য বিমান অবতরণের মতো উপযুক্ত বিমানবন্দর সেখানে ছিল না। তিন দিন তিন রাত এক করে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিবৃষ্টির মধ্যেও সমস্ত রকমবাধা সরিয়ে বিমান অবতরণের মতো ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলেন। কয়েকজন স্বয়ংসেবক মারা গেলেন। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। পাকিস্তানের স্লোগান ছিল— 'হঁস কে লিয়া পাকিস্তান লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান'। জিন্নার বক্তব্য ছিল পোকায় কাটা দুটো অংশের জন্য আমরা লড়াই করিনি। আমাদের লক্ষ্য দিল্লি। পাকিস্তানের মদতে মুসলিম লিগের গুন্ডারা দিল্লির বেশ কিছু জায়গায় বোমা অস্ত্র শস্ত্র মজুত করল। ঠিক হলো পার্লামেন্ট অধিবেশনের সময় শক্তিশালী বোমা মেরে পার্লামেন্ট উড়িয়ে দেওয়া হবে। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হবে। সেই সময় পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করবে।

কয়েকজন স্বয়ংসেবক এই কথা জানতে পেরে লিগ সমর্থকের ছদ্মবেশে, এমনকী নিষিদ্ধ মাংস খেয়ে সমস্ত তথ্য উদ্ধার করে বল্লভ ভাই প্যাটেলের কাছে পাঠালেন। বল্লভভাই প্যাটেল প্রথমে বিশ্বাস করেননি, লোক পাঠিয়ে জানতে পেরে কড়া হাতে তাদের দমন করলেন। দেশের যে কোনো বিপদে আপদে সঙ্ঘ প্রথম সারিতে থাকে। খরা, বন্যা, ভূমিকম্প কাশ্মীর, গোয়া, হায়দরাবাদ মুক্তি অভিযান— যখনই কোনো রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় এসেছে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। '৬৫-র পাকিস্তানি আক্রমণের সময় সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য তদানীন্তন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীকে আনতে বিশেষ বিমান পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী। ৬২-তে চীন আক্রমণের সময় দিল্লির পুলিশরাও যুদ্ধে চলে যাওয়ার কারণে দিল্লির ট্রাফিক ব্যবস্থা সামলেছিল সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। সর্বতো ভাবে সাহায্য করার কারণে ১৯৬৩ সালে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে সঙ্ঘকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু।

জয়প্রকাশ নারায়ণ একসময় সঙ্ঘ বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বিহারের ভয়ংকর খরায় সঙ্ঘের সেবাকাজ, জরুরি অবস্থার সময় স্বয়ংসেবকদের ভূমিকা দেখে বলেছিলেন— 'সঙ্ঘ যদি সাম্প্রদায়িক হয় তাহলে আমিও সাম্প্রদায়িক'। যারা ভারতবর্ষের ক্ষতি করতে চায় তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এক মূর্তিমান বিভীষিকা। স্বয়ংসেবকরা পাথর ছোড়ে না, রেললাইন উপড়ায় না, ট্রেন পোড়ায় না, বাস ভাঙচুর করে না, জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করে না, কারণ রাষ্ট্রের প্রতি রয়েছে তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা অথচ এই সংগঠন সরকারিভাবে বারবার আক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতার পর গান্ধী হত্যার মিথ্যে অজুহাতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সঙ্ঘকে। যদিও আইন, আদালত, বিভিন্ন কমিশন, সর্বত্র প্রমাণিত হয়েছে যে গান্ধী হত্যার সঙ্গে সঙ্ঘের কোনো সম্পর্কই ছিল না। সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জওহরলাল নেহরুকে লিখেছিলেন— 'গান্ধীজীর হত্যার ব্যাপারে যে কার্যকলাপ চলছে, সেগুলির বিষয়ে আমি পুরোপুরি অবগত আছি। একথাও অসন্দিগ্ধ রূপে প্রকাশিত হয়ে গেছে যে আরএসএস-এর সঙ্গে গান্ধী হত্যার কোনো সম্পর্ক নেই'। ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসবার পর নতুন করে আবার কমিশন গঠন করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী হত্যার তদন্তের জন্য সর্বোচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জীবনলাল কাপুরের সভাপতিত্বে বহু লোকের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। দলিল দস্তাবেজের পরীক্ষার পর ফলাফল সেই একই, গান্ধী হত্যার সঙ্গে সঙ্ঘের কোনো সম্পর্ক নেই। জরুরি অবস্থার সময় বহু সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সঙ্ঘকেও নিষিদ্ধ করা হয়। অযোধ্যায় বিতর্কিত ধাঁচা ধ্বংসের পরও সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, আদালতের চড় খেয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। সবই কিন্তু কংগ্রেস আমলে। কোনোভাবেই সঙ্ঘকে কবজা করতে না পেরে, কংগ্রেস নেতৃত্ব ১৯৬৬-তে একটি প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করে, যেখানে বলা হলো সরকারি কর্মচারীরা আরএসএস করতে পারবেন না। আসলে ধান্দাবাজ রাজনৈতিক নেতাদের বরাবরের চক্ষুশূল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। যদিও এই কালা নির্দেশিকা সঙ্ঘকে বিন্দুমাত্র দমাতে পারেনি। পরবর্তীকালে এই নিয়ে অনেক আইন আদালত হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই স্বয়ংসেবকদের জয় হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট সঙ্ঘ করবার কারণে বরখাস্ত হওয়া কর্মচারীর চাকরি বিনা শর্তে ফিরিয়ে দিয়েছে। তবুও সঙ্ঘকে অপমান করবার উদ্দেশ্য নিয়েই যেন দীর্ঘদিন অকেজো এই আইনটি রেখে দেওয়া হয়েছিল। মাঝে মধ্যে সঙ্ঘকে বিব্রতও করা হতো। ব্রিটিশ প্রভাবিত দণ্ডবিধি পরিত্যাগ করে নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা প্রচলনের পর ব্রিটিশ প্রভাবিত এই কালা কানুন রদ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও এই আইন থাকল কী থাকল না, তাতে সঙ্ঘের কোনও যায় আসে না। আজ শতবর্ষের দ্বারে উপনীত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার বিশাল শক্তি নিয়ে সুস্থ সমাজ গঠনে ধীরে ধীরে অবিচল লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে অনেকেই বলে থাকেন Ready for Selfless Service। □

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র সরকারের অমৃত উপহার

কেন্দ্রের রাষ্ট্রবাদী সরকারের সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে সব থেকে বড়ো যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক সেবা প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র। প্রত্যেকটি পোস্টাল পিনকোড ধরে এক একটি প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত। এই ঔষধি কেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ সংগ্রহ করতে পারে। পাশ্চাত্য ভোগবাদের প্রভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেবা থেকে পরিষেবাতে পরিণত হয়েছে। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের রাষ্ট্রবাদী সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে চিকিৎসা পরিষেবা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিতে সংকল্পবদ্ধ। এই সংকল্পবদ্ধতা বাস্তবায়িত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র বাস্তবায়িত হওয়ার মধ্য দিয়ে। সাধারণ মানুষ বাজার চলতি ওষুধের দোকানগুলোর থেকে কোনো ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং কোনো ক্ষেত্রে নব্বই শতাংশ কম দামে তাদের প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধ পাচ্ছে। রাষ্ট্রবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাফল্যকে প্রচারের আলোয় আনা প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রান্তিক মানুষের উন্নতির স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত উন্নতির স্বার্থে কেন্দ্রের রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের হাতে স্বাস্থ্য পরিষেবার যে নতুন পথ খুলে দিয়েছে আগামী দিনের রাষ্ট্র গবেষকদের কাছে তা একটি গবেষণার বিষয় হিসেবে উল্লেখিত থাকবে। বহুজাতিক মুনাফা লোভী ওষুধ কোম্পানিগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেশের এবং রাজ্যের বিজেপি বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্রের ওষুধ ঠিকমতো কাজ করে না। এর ফলে এই প্রকল্পের প্রকৃতস্বপ্ন কিছুটা হলেও বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলকে এবং রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্রের অভিমুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। কারণ মুনাফা লোভী ওষুধ কোম্পানিগুলি এবং তাদের সাহায্যকারী বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রচারে সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্রের ওষুধ ঠিকমতো মানুষকে রোগের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করবার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। বিজেপি বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং একশ্রেণীর মুনাফা লোভী ব্যবসাদার এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্য শিল্পী।

সাধারণ মানুষের হাতে ন্যায্য মূল্যে জীবনদায়ী ওষুধ তুলে দেবার অন্যতম উজ্জ্বল প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী জনঔষধালয়। সাধারণ মানুষের পকেটের সীমাবদ্ধতাকে সামনে রেখে মানুষকে উন্নততর যুগোপযোগী ওষুধ তুলে দেবার সংকল্পকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের সামাজিক পথপরিক্রমা। এই পথকে রুদ্ধ করবার জন্য যত রকম অপপ্রচেষ্টা করা যায় ঠিক তত রকমের অপপ্রচেষ্টা ইতিমধ্যে জারি হয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সার্বিক লড়াই জারি রাখবার জন্য রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলকে একটু বাড়তি দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন।

যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে শুধুমাত্র ওষুধের বিল হয় বেসরকারি ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এআইএমএস হাসপাতাল-সহ দেশের সমস্ত পিনকোডে একটি করে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র, কেন্দ্রের রাষ্ট্রবাদী সরকারের নিরাময় অমৃত উপহার। এই উপহারকে দেশের মানুষ নিজেদের চোখের মণির মতো রক্ষা করবে।

পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র সম্পর্কে আরও বেশি করে গ্রাহক সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন দেওয়া, তার সঙ্গে প্রয়োজন রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করবার প্রচার। সমস্ত চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রে সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় প্রমাণ করছে অপপ্রচারের জাল ক্রমশ ছিন্ন হচ্ছে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলকাতা।

বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম, পুড়ছে আমজনতার হাত

প্রায় তিন মাস ধরে লোকসভা ভোটের পর্ব শেষ হলো। সরকার গঠন হলো। এরপর শুরু হলো জনতার উপর আর্থিক শোষণ। আর হবেই না বা কেন! ভোটের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ইলেক্টোরাল বন্ডের নামে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে বিভিন্ন দল অর্থ নিয়ে থাকে। যেমন ধরুন রিলায়েন্স জিও ভোট পর্ব মিটতেই তাদের রিচার্জ প্ল্যানের দাম বাড়িয়ে দিল। গরীব মানুষ ফোনে কথা বলতে গেলে ন্যূনতম ২০০ টাকা রিচার্জ করতে হবে। যেখানে দৈনন্দিন জীবনে চাল, ডাল, শাক, সবজি, আলু সবকিছুর দাম ঊর্ধ্বগামী সেখানে ভোটের পর সাধারণ মানুষের স্বস্তি কোথায়? আসলে কিছু জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে কর্পোরেট কোম্পানির জন্য আর কিছু জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে কৃষিজাত উৎপাদন কম হওয়ার জন্য। বর্তমানে কৃষিপ্রধান দেশ হলেও কৃষকরা চাষের কাজ থেকে বিমুখ হচ্ছেন। তার প্রধান কতকগুলো কারণ আছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক যেমন কালোবাজারি হয়, তেমনই উচ্চফলনশীল

ভালো জাতের ধান, আলু, গম ইত্যাদি বীজে ভেজাল থাকায় ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার জন্য অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাটির উর্বরতা ক্রমশ কমছে। কোথাও কোথাও চাষের জন্য জলের অভাব আছে। ফসল যখন চাহিদার তুলনায় বেশি উৎপাদন হয় তখন চাষিরা ঠিকমতো দাম পান না বা ঋণের জালে জড়িয়ে গেলেও এতো হইচই হয় না। ফলে চাষি আত্মহত্যা করতে বাধ্যও হন। কিন্তু সামান্য কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে চারিদিকে হইচই শুরু হয়ে যায়। আসলে এই আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে চাষি আদৌও কতটা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন তাতে সন্দেহ আছে। কারণ মাঝে ফড়েরা চাষির কাছ থেকে মালপত্র নিয়ে নিজেদের মতো বিক্রি করে। বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। আসলে এখন যেমন টাস্কফোর্স বাজারে সক্রিয়, এরকম সক্রিয়তা মাঝে মাঝে থাকা উচিত। এমনকী চাষিরা যখন সার, কীটনাশক, বীজ কালোবাজারিদের থেকে কিনতে বাধ্য হন। সারা বছর একই ভাবে সক্রিয় থাকতে হবে। প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির ফলে আমজনতার বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষজন খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। দৈনন্দিন সংসার খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। তারপর যদি অসুখ বিসুখ থাকে তাহলে তো রেহাই নেই।

মানুষের মাথাপিছু গড় আয় কমেছে অন্যদিকে মাথাপিছু দৈনন্দিন খরচ বেড়েছে। এর ফলে চাহিদা পূরণ করতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের উচিত সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা, প্রয়োজনে সরকারের কিছু পলিসি পরিবর্তন করা। ভোট তো পেয়েছেন, জয়ও হয়েছে। দয়া করে সাধারণ মানুষকে একটু ভালো ভাবে খেয়ে পরে বাঁচতে দিন।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোণারোড,
পশ্চিম মেদিনীপুর।

জনসঙ্ঘ, মেদিনীপুর ও শ্যামাপ্রসাদ

চন্দ্রশেখরবাবুর সুপাঠ্য ও অতীতের মেদিনীপুর জেলার জনসঙ্ঘের ইতিহাসের কথা লিখে নতুন করে, নবপ্রজন্মদের জ্ঞাত করানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সামান্য দু' এক কথা সংযোজন করতে চাই। ১৯৩৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর, ২১তম অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়, আর ২২তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মাদুরাই-তে। এছাড়া উনি বলেছেন যে, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে সাংসদ হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম লোকসভা আসন থেকে। আর মেদিনীপুরের অকৃত্রিম বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠন করেন, তার সভাপতি হিসেবে বদ্রীনাথ গোয়েঙ্কা, সহ-সভাপতি হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বি কানোরিয়া। সে সময় অবশ্য একাধিক কমিটিও গঠন করা হয়েছিল।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

তথ্য সংশোধন

'স্বস্তিকা পত্রিকার ২৯ জুলাই সংখ্যায় ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, জনসঙ্ঘের মেদিনীপুর ও তার উত্তরাধিকার'-এর ৩৮ পৃষ্ঠায় আছে যে জাতীয় কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সেই প্রথম, দ্বিতীয় বৃহৎ দলের মর্যাদা অর্জন করল জনতা দল। বিরোধী দলনেতা হলেন প্রফুল্ল সেন। তথ্যটি ভুল। বিরোধী দলনেতা হয়েছিলেন, জনতা দলের বিধায়ক কাশীকান্ত মৈত্র।

—ভোলানাথ নন্দী,
মানিকপুর, মেদিনীপুর।

সুপ্রিম আদেশ

দু' দিন আগে লোকসভায় দেশের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও সপা নেতা অখিলেশ যাদব নিট পরীক্ষা নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে কটাক্ষ করেছে। রাহুল গান্ধী তো বলেই দেয়, 'যাদের টাকা আছে তারা চাইলেই টাকা দিয়ে নিট পরীক্ষার ফল কিনতে পারে।' আর সমাজবাদী পার্টির নেতা বলে এই সরকার নিট পরীক্ষার পেপার লিকের রেকর্ড করেছে। এদিকে গত ২১ জুলাই কলকাতার তৃণমূল শহীদ দিবসে অভিষেক ব্যানার্জি আরও এক ধাপ এগিয়ে বলে, টেট পরীক্ষা নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হলে— নিট পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কেন গ্রেপ্তার হবে না? মস্ত বড়ো নির্লজ্জ না হলে এই তুলনা কেউ টানতে পারতো না। তৃণমূলের যে শিক্ষামন্ত্রীর সুন্দরী অল্পবয়সী বান্ধবীর বাড়ি থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কোটি কোটি টাকা ও কেজি কেজি সোনার গহনা ও মণি মাণিক্য উদ্ধারের পর কোন মুখে অভিষেক ব্যানার্জি এই মন্তব্য করে? ২১ জুলাই কলকাতার সভায় এই কথা অখিলেশ যাদবের মনে ধরে। তাই দুদিন আগে লোকসভায় অখিলেশ যাদব ধর্মেন্দ্র প্রধানের অপসারণের কথা বলে। রাহুল গান্ধী নাবালকের মতো বলে যার টাকা আছে সেই কিনে নিতে পারে। টাকা দিয়ে যদি নিটের ফল কেনা যেত তাহলে কি কো-পাইলটের পুত্র এতদিনে ডাক্তার হয়ে যেত না? ওদের তো টাকার অভাব নেই।

আসলে এই রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব ও অভিষেক ব্যানার্জিদের মাথায় দেশের কথা ও দেশের যুব শক্তির ভাবনা নেই। থাকলে মিছিমিছি ভারতের পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কখনোই প্রশ্ন তুলত না। এর ফলে বিশ্বের অন্য দেশের কাছে আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে পড়ে যেত। সুপ্রিম কোর্ট এই দিকটাও খতিয়ে দেখেছেন। তাই নিট পরীক্ষা বাতিল না করে কোর্ট জানিয়ে দেয়, স্থানীয় স্তরে কিছু অনিয়ম হলেও এমন কোনো বড়ো ঘটনা ঘটেনি যে তার জন্য গোটা পরীক্ষা বাতিল করতে হবে। সিবিআই তদন্ত যেমন চলছে তেমন চলবে। কোনো ছাত্র দোষী হলে কাউন্সেলিংয়ের আগেই শাস্তি পাবে। ঠিক এই কথাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সংসদে বলেন। তখন তৃণমূল, সপা, ডিএমকে, কংগ্রেস হইচই করে। হইচই করতে জানে, সমাধান জানে না। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে ওদের মিথ্যা ন্যারেটিভের মাটি পায়ের তলা থেকে সরে গেল।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

মেয়েদের সুরক্ষা মেয়েদের হাতে

সুদেষ্ণা রায়

একসময় নির্ভয়াকাণ্ড আমাদের দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এখন আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে নির্যাতন ও হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশ তোলপাড়। আমাদের দেশে প্রশাসন এবং আইন প্রণয়নকারীরা এই ধরনের অপরাধের বিভিন্ন দিক বিচার করেছেন এবং অপরাধীর নাবালকত্ব এবং সাবালকত্বের সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছেন। মোটের উপর নারীর প্রতি চরম লাঞ্ছনা এবং অবমাননাকারীর প্রতি আইন প্রণয়নকারীদের ভাবনা চিন্তার একটা প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এত গেল অপরাধ সংগঠিত হওয়ার পর প্রতিকারের আয়োজন ও ব্যবস্থা। কিন্তু যেক্ষেত্রে নির্যাতিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন সেখানে প্রতিকারের থেকে প্রতিরোধের আগাম চিন্তা করাই যুক্তিসঙ্গত এবং যা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করবে। আজ থেকে একশো বছর আগে একজন নারীর জীবনযাপনের রূপরেখা আজকের প্রেক্ষাপটে কোনোভাবেই প্রযোজ্য হয় না। আজকের নারী বিভিন্ন কারণে বাড়ির বাইরে যায় বা যেতে হয়। তার শিক্ষার জন্য, তার চাকুরি বা জীবিকার জন্য এবং অন্যবিধ প্রয়োজনেও তাকে বেরোতে হয়। আমাদের সমাজে দুষ্প্রবৃত্তি পরায়ণ ব্যক্তিদের শুধু সংখ্যাধিক্যই ঘটেনি, তাদের এই অমানবিক, পাশবিক আচরণকেও পরোক্ষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞাপন এবং তথাকথিত বিদগ্ধ মানুষেরা এই রকম কাজ করছেন। যার ফলে এই ধরনের দুর্বৃত্তরা এক ধরনের সহায়তা লাভের আশ্বাস পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মেয়েদের বা নারীজাতিকে নিজের সম্মান, সুরক্ষা, সর্বোপরি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হচ্ছে। আমাদের দেশে আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে খালসা পন্থের উদ্ভব হয় যেখানে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে অস্ত্রধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে আইনের চোখে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে অস্ত্রধারণের বা অস্ত্রবহনের অনুমতি দিলেও এটা সাধারণভাবে সমাজের সব স্তরের মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই সর্বপ্রথম প্রতিরোধের জন্য নিঃশস্ত্র প্রতিরোধের কলাকৌশল শিক্ষার অপরিহার্যতা অনুভব করা যায়। এই ধরনের কলাকৌশলের মধ্যে সর্বপ্রথম আমরা আমাদের দেশজ যে সকল কলাবিদ্যা আছে, সেগুলির অনুশীলন করতে পারি। যেমন— কালাডি। মণিপুরেও এই ধরনের মার্শাল আর্ট প্রচলিত আছে। এছাড়াও বিদেশি জুডো, ক্যারাটে, কুংফু, কিক বক্সিং এগুলোতেও মেয়েদেরকে প্রশিক্ষিত করবার উদ্যোগ নেওয়ার দরকার। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় এগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খানিকটা সখের শরীরচর্চার অঙ্গ হিসাবে অনুশীলিত হয়। তাই যখন কোনো মেয়ে বিপদে পড়ে তখন এই বিদ্যা খুব বেশি কাজে লাগানো যায় না। কারণ তার শিক্ষাটাই থাকে বহুলাংশে আর পাঁচটা এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের মতো। তাতে প্রতিরোধ করার যে মৌলিক চিন্তা, সেটা রক্ষা হয় না। আজকের পরিস্থিতিতে মেয়েদের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ) এই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য উৎসাহিত করার দরকার আছে এবং বিশেষভাবে সমাজের সর্বাধিক সংখ্যার মেয়েরা যেহেতু বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয় স্তর অবধি) প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণ করে, তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এ বিষয়ের বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তার সঙ্গে ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং এই পরিকল্পনার ফলাফল নিয়ামক কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত জানাতে হবে।

যদি এইভাবে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা শুরু করা হয়, তো কয়েক বছরের মধ্যে এক বিশালসংখ্যক এই ধরনের কলাকৌশল প্রশিক্ষিতাদের দেখতে পাবো। পরিণতিতে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিসম্পন্ন মেয়েদের সম্পর্কে দুরাচারীরা তাদের ভাবনা পরিবর্তন করবে। কারণ এই ধরনের কাজ করতে যাওয়ার আগে তারা দু'বার ভাবতে বাধ্য হবে। মানুষ মাত্রেই জীবন রক্ষার এবং সম্মান রক্ষার অধিকার আছে। আর সেই অধিকার সুনিশ্চিত করার অধিকারও আছে। তাই আজ মেয়েদের সুরক্ষার জন্য মেয়েদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। অবশ্যই সমাজকেও এব্যাপারে সহায়তা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির আয়োজন করতে হবে। ■

হোমিওপ্যাথিতে মৃগী রোগের প্রতিকার

ডাঃ বলরাম পাল

মৃগী একটি স্নায়ু ঘটিত রোগ। কিছু স্নায়ুর আকস্মিক, অস্বাভাবিক, অত্যধিক ক্রিয়াকলাপের ফলে এই রোগটি ঘটে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের প্রত্যেকটি নার্ভ কোষ বা নিউরোনের একটি সুনির্দিষ্ট বিদ্যুৎক্ষরণ (electrical discharge) ক্ষমতা থাকে কিন্তু মৃগী রোগের ক্ষেত্রে একাধিক নিউরোনের অস্বাভাবিক এবং মাত্রাতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্ষরণ হয়, ফলে রোগীর দেহে কিছুটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই সময়ে রোগীর মস্তিষ্ক কিছুক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সময়টা কয়েক সেকেন্ড থেকে দু' মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এই অবস্থাকে মৃগী বলা হয়।

মৃগী রোগের সাধারণ লক্ষণ :

১. যে কোনো একটা হাত বা পায়ে বা সারা শরীরেও খিঁচুনি হতে পারে। ২. মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। ৩.চোখ ওপরে স্থির হয়ে যাওয়া। ৪. দাঁত লেগে জিভ কেটে যাওয়া।

এছাড়াও মৃগীর অন্যান্য লক্ষণ থাকতে পারে। যেমন :

১. হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দুম করে পড়ে যাওয়া। ২. লিখতে লিখতে ঝাঁকুনি দিয়ে পেন ছিটকে যাওয়া। ৩. সকালবেলা ব্রাশ করতে গিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে হাত থেকে ব্রাশ ছিটকে যাওয়া।

ছোটোদের আবার অন্য লক্ষণও দেখা যায় :

১. মাত্রাতিরিক্ত চোখ পিটপিট করা। ২. কথা বলার সময় কথা জড়িয়ে যাওয়া। ৩. কথা বলার সময় অন্যমনস্ক বা অমনোযোগী হওয়া। ৪. হঠাৎ শরীরের ঝাঁকুনি হওয়া। ৫. দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চার দুম করে পড়ে যাওয়া।

ছোটোদের এবং বয়ঃসন্ধির সময় এই রোগ বেশি হওয়ার প্রবণতা থাকলেও কিন্তু সদ্যোজাত শিশু থেকে প্রবীণ সব বয়সী মানুষদেরই এপিলেপ্সি বা মৃগী হতে পারে। এপিলেপ্সির লক্ষণ দেখা দিলে কি কি করা উচিত :

১. শরীরে যে জার্ক বা খিঁচুনি হয় সেটাকে না আটকানো ভালো। কারণ জার্কগুলো অল্প সময় পরে বন্ধ হয়ে যায়।

২. রোগীকে যদি শোয়ানোর মতো জায়গা থাকে তাহলে একদিকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেওয়া উচিত, যাতে মুখ দিয়ে নির্গত ফেনা বাইরে বের হয়ে যায় এবং তাতে করে নির্গত ফেনা শ্বাসনালী অবরুদ্ধ করবে না।

৩. রোগীকে বদ্ধ জায়গায় না রেখে হাওয়া বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখতে হবে।

৪. রোগীকে আলাদা করে ধরে রাখতে হবে।

৫. মাথায় অকারণে জল না ঢালাই ভালো।

৬. রোগী একটু স্বাভাবিক হলে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

উল্লেখ্য মৃগী রোগী এবং হিস্টিরিয়া রোগীর মধ্যে পৃথকীকরণ খুবই জরুরি তা না হলে চিকিৎসায় ভুল হয়ে যাবে।

চিকিৎসা :

যদিও আমরা জানি হোমিওপ্যাথিতে কোনো রোগের নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ নির্বাচন করা যায় না, তথাপি হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার মহাসমুদ্র থেকে কিছু অমৃত অনুসন্ধানের চেষ্টা করি।

বুফো রানা : এই ওষুধটি সাধারণত মহিলাদের জন্য সহায়ক, যারা মাসিকের সময় খিঁচুনি অনুভব করেন। এছাড়া ঘুমের মধ্যে যদি মৃগীর আক্রমণ হয় তখন বুফো রানা খুব কার্যকরী।

সিকিউটা ভিরোসা : মৃগী রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সিকিউটা একটি অত্যন্ত কার্যকরী ওষুধ। সাধারণত এই ওষুধটি মাথার আঘাতের ইতিহাস এবং কৃমি দ্বারা উদ্ভূত মৃগী রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের মৃগীতে খিঁচুনি হিংস্র রূপ নেয়, মেরুদণ্ডে ভয়ঙ্কর পশ্চাৎমুখী বাঁক থাকে। খিঁচুনির সময় ব্যক্তির মুখ নীলাভ হয়ে যায় এবং শক্তভাবে দাঁত লেগে যায়।

কিউপ্রাম মেট : যদি দেখা যায় খিঁচুনি হাতের আঙুল বা পায়ের আঙুলে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে শরীরের বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়ে, বিভিন্ন পেশীতে ঝাঁকুনি দেয় সেক্ষেত্রে কিউপ্রাম মেট ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়। আবার এটি মাসিকের সময় এবং শিশু প্রসবের পরে খিঁচুনির চিকিৎসার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

হায়োসায়ামাস : কিছু ক্ষেত্রে মৃগীরোগের আক্রমণ গভীর ঘুমের মধ্যে বা ঘুম ভাঙলে হয় এবং সেই সময় রোগী বিছানার চাদর খামচে ধরে এবং বিছানায় হাত বোলাতে থাকে যেন কিছু খুঁজছে। এই ধরনের লক্ষণে হায়োসায়ামাস দিয়ে চিকিৎসা করা যায়।

স্ট্র্যামোনিয়াম : উজ্জ্বল ঝলমলে আলো বা চকচক করছে এমন বস্তুর সংস্পর্শে আসার ফলে খিঁচুনি শুরু হলে স্ট্র্যামোনিয়াম ভালো ওষুধ। তবে এক্ষেত্রে, রোগীর চেতনা হারায় না কিন্তু শরীরের পেশীতে ঝাঁকুনি অনুভব করে।

উপরিউক্ত ওষুধগুলি ছাড়া আরও বহু ওষুধ হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকায় উল্লেখ করা আছে। তথাপি হ্যানিম্যান আবিষ্কৃত তত্ত্ব 'অর্গানন অব মেডিসিন' অনুযায়ী ওষুধ নির্বাচনের যা পদ্ধতি আছে সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করে ওষুধ নির্বাচন করতে হবে।

রাখিবন্ধন ও মহিলা সুরক্ষা

পারুল মণ্ডল

ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। বিশেষত হিন্দুসমাজে ধর্মীয় উৎসব বাদেও এমন অনেক সামাজিক উৎসব রয়েছে যা মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তার মধ্যে অন্যতম হলো রাখিবন্ধন। রাখিপূর্ণিমাকে ঘিরে নানান পৌরাণিক ঘটনার অবতারণা করা হয়। কথিত আছে যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর বানর সেনার হাতে ফুলের রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। রাখিবন্ধন উৎসবে ভাই-বোনেদের মধ্যেকার স্বর্গীয় সম্পর্ককে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিনে বোনেরা ভাইদের হাতে সুন্দর, পবিত্র রাখি বেঁধে দেয় নিরাপত্তা ও রক্ষার প্রতীক হিসেবে। ভাই-বোনের মধ্যে স্বর্গীয় সম্পর্ক-স্বরূপ যে স্নেহের বন্ধন রয়েছে— তার প্রতীক হিসেবে রাখিবন্ধন উদ্‌যাপন করা হয়। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাই-বোনের উদাহরণ। কথিত আছে যে শিশুপালকে বধ করার সময় শ্রীকৃষ্ণের হাত কেটে গেলে দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ তাঁর বহুমূল্য শাড়ির আঁচল থেকে কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের হাতে বেঁধে দেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে সারা জীবন তাঁর সম্মান রক্ষার্থে তিনি সর্বদা চেষ্টা করবেন। ভগবান তাঁর কথা রেখেছিলেন। দুর্যোধনের রাজসভায় চরম কলঙ্কের হাত থেকে তিনি দ্রৌপদীকে রক্ষা করেছিলেন। ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ অনুযায়ী ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন বলি রাজাকে পরাজিত করে তিনটি জগতের অধিকার নিয়েছিলেন, তখন রাজা বলির অনুরোধে তিনি তাঁর প্রাসাদে অবস্থান করেছিলেন। এতে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবী বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনে সাধারণ মেয়ের ছদ্মবেশে রাজা বলির হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে তাঁর স্বামী শ্রীবিষ্ণুকে ফিরে পাওয়ার অনুরোধ করেন। তখন ভগবান বিষ্ণু বলি রাজার রাজত্ব ছেড়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে যান।

হিন্দু রীতিতে বড়দিদিকে মাতৃস্থানীয়া এবং বড়ভাইকে পিতৃস্থানীয় সম্মান দেওয়ার নিয়ম বিদ্যমান। বোন তার ভাইয়ের অমঙ্গল দূর করার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করে। অন্যদিকে ভাই তার বোনকে সর্বাধিক স্নেহ করে এবং সব সময় রক্ষা করে চলে। কিন্তু বর্তমান যুগে কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতায় ভাই-বোনের মধ্যে সেই স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে! বঙ্গপ্রদেশেও সাড়ম্বরে রাখিবন্ধন উৎসব পালনের রীতি ও পরম্পরা অতি প্রাচীন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে পরস্পরকে রক্ষা করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই ঐতিহ্য এখনও রয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বোন ভাইকে ছাড়াও সবাই সবাইকে রাখি পরায় এবং একে অপরকে রক্ষা করার সংকল্প নেয়।

কিন্তু বিগত ১০-১৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের উপর যেরকম নারকীয় অত্যাচার হচ্ছে, তাঁদের মান-সম্মান লুণ্ঠিত হচ্ছে, তাতে বাঙ্গালির রাখিবন্ধন উৎসবের গুরুত্ব ও মাহাত্মের বৃহত্তর প্রচার এবং ব্যাপক আকারে এই উৎসব উদ্‌যাপন অত্যন্ত দরকারি হয়ে পড়েছে। মহিলারা বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার লক্ষ্য হয়ে উঠছেন। ২০১৩ সালে কামদুনি কাণ্ড, ২০১৬ সালে ধুলাগড়ে যে সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়, তার প্রধান লক্ষ্য ছিলেন মহিলারা। ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি কিছুই বাদ যায়নি। ২০১৭ সালে বসিরহাটে গণধর্ষণের ঘটনা, ২০১৯ সালে মহিলা ভোটারদের ওপর আক্রমণ, ২০২০ সালে জনজাতি মহিলার ওপর অত্যাচার, ২০২১ সালে মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানি, রাজ্যের শাসক দলের তরফে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে অসংখ্য হিন্দু মহিলার সম্ভ্রমহানির ঘটনা ঘটে। ২০২১ সালে কলকাতা দেশের প্রথম ১৯টি শহরের মধ্যে ছিল যেখানে মহিলাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অত্যাচারের ঘটনা নথিবদ্ধ হয়। সেই বছর এক হাজারের উপর নারী সম্ভ্রমহানির ঘটনা ঘটেছিল। এরাজ্যে মহিলা চিকিৎসকও নিরাপদ নন।

২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ৪০ দিনে একটি করে নারী-সম্ভ্রমহানির ঘটনা সামনে আসে। ফলে পশ্চিমবঙ্গকে অনেকে Rape state বলা শুরু করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বহু মেয়ে লাভ জেহাদের শিকার। '৯০-এর দশকে বানতলা, ধানতলা, কেশপুর, নামখানা, গলসি— নারী নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে মাত্র কয়েকটি নাম। ২০২২ সালে হাঁসখালির মর্মান্তিক ঘটনার পর এই রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন— 'দেখো হয়তো মেয়েটির কোনো প্রেম ভালোবাসা বিষয়ক ঘটনা চলছিল। তাই সে ধর্ষিতা হয়েছে'।

আর সন্দেশখালি তো এখনও জ্বলছে। সন্দেশখালির ঘটনাতে একের পর এক মহিলারা মুখ খুলতে শুরু করেছেন। শাসক দলের নেতা ও জেহাদিরা যদি মহিলাদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন নামিয়ে আনে, তবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কী উপায় থাকতে পারে? বিশেষত সন্দেশখালির ঘটনার পর কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মহিলাদের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে যা মন্ত্রীসভার অনুমোদন লাভ করেছে। এই নারী সুরক্ষা স্কিমের জন্য সব মিলিয়ে মোট ১১৭৯.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নারী সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ, ন্যায়বিচার এবং যে অভিযোগগুলি আসছে সেগুলি নথিবদ্ধ ও দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়গুলি দেখা হবে। প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনা রুখতে এবং কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধে বাঙ্গালি সমাজের সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাড়ির মেয়েরা পড়াশোনার বা চাকরি-বাকরির জন্য ঘর থেকে বাইরে বেরোলে যদি সুরক্ষিত না থাকে, তাহলে তা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অশনি সংকেত। রাখিবন্ধনের পবিত্র দিনে আমাদের শপথ নিতে হবে যে আমাদের পরিবারের এবং সমাজের সব মহিলা যেন স্বাধীন ও সুরক্ষিতভাবে, সর্বত্র চলাফেরা করতে পারেন। ■

রাখিবন্ধন উৎসব ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

রাজদীপ মিশ্র

ভারতবর্ষ উৎসবের দেশ। এখানে একটি উৎসবের রেশ শেষ হতে না হতেই পরের উৎসব দরজায় কড়া নাড়ে। এই উৎসবগুলি ভারতবর্ষকে যুগযুগ ধরে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে, সুশৃঙ্খলিত করে রেখেছে। মহাকবি কালিদাস বলেছেন— 'উৎসবপ্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ'। উৎসবের মাধ্যমে মানুষ হৃদয়ের ভাব আদানপ্রদান করে মহান হয়। নিজের মহানতার পরিচয় দিয়ে দেশ, জাতি, ধর্মের কথা চিন্তা করে ধর্মরক্ষার তাগিদে দেশকে শক্তিশালী ও অখণ্ড রাখার প্রতিজ্ঞা করে।

এরকমই একটি উৎসব হলো রাখিবন্ধন উৎসব। রাখি কথাটা এসেছে 'রক্ষা' শব্দ থেকে। পরস্পরকে রক্ষা করার ভাবনা নিয়েই রাখিবন্ধন উৎসব। ব্যক্তি যেমন পরিবার এবং সমাজকে রক্ষা করবে, সমাজও সেইরকম ব্যক্তি ও পরিবারকে রক্ষা করবে। এই রক্ষার প্রক্রিয়া উভয়ত সত্য। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু সমাজে, রক্ষাবন্ধন প্রথা বা উৎসব অক্ষুণ্ণ ধারায় চলে আসছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা সমাজে স্নেহের বন্ধনে পরস্পরকে আবদ্ধ রাখার জন্য রক্ষাবন্ধন প্রচলন করেন। প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায়, তার বিপদ আপদ থেকে রক্ষার কামনায় যে মঙ্গলসূত্র বাঁধা হয়— সেটি রাখিরই নামান্তর। রাখিবন্ধন হলো পারস্পরিক ভালোবাসা ও একাত্মতা প্রকাশের একটি আবেগপূর্ণ সামাজিক উৎসব।

জন্মের পুণ্যলগ্নে কোমরে সুতো (ঘুনসি) বেঁধে রক্ষার সূত্রপাত। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ সব অনুষ্ঠানে সুতো বেঁধে রক্ষাও একসঙ্গে থাকার অঙ্গীকার। মায়েরা যে বিপত্তারিণীর সুতোর তাগা বাঁধেন, তা একপ্রকার ব্যক্তি, পরিবার রক্ষার ব্রত উদ্‌যাপন।

রাখিবন্ধন একটি প্রাচীন পরম্পরা। এর উল্লেখ বেদে আছে—

'সদা বধ্নন্ দাশায়ণা হিরণ্যং শতানিকায় সুমনস্যমানাঃ।
তস্ম অবধ্নামি শতশারদায়াসুষ্মাম্ জরদষ্টির্যথাসম্।।'

(শুক্ল যর্জুবেদ, রাজসনেয়ি সংহিতা, ৩৪ অধ্যায়, ৫২ কান্ডিকা)

অর্থ : দশবংশোৎপন্ন ব্রাহ্মণ পুরোহিত আমি রাজাশতানীবোর মণিবন্ধে এই স্বর্ণিম রক্ষাসূত্র বন্ধন করছি।

ফলশ্রুতিতে মহারাজ যেন আয়ুষ্মান শতশারদজীবী জরারোহিত কলেবরে শোভনসমযুক্ত হোন।

বর্তমানে যে মন্ত্র রক্ষাবন্ধনকালে উচ্চারিত হয়, সেটি পৌরাণিক যুগের স্মারক, সত্যযুগে সমাজ সুরক্ষার জন্য ভগবান বিষ্ণু বামন অবতার রূপে দানবরাজ বলিকে রক্ষাবন্ধনসূত্রে আবদ্ধ করেন। সত্যযুগের বলি-বামন উপাখ্যানের মন্ত্রটি হলো—

'যেন বদ্ধ বলিরাজা দানবেন্দ্র মহাবল :
তেন ত্বাং অনুবধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল।।'

অর্থাৎ বলিরাজাকে যেভাবে রক্ষাবন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছিল, আমিও তেমনি তোমাকে রক্ষামন্ত্রে রক্ষাবন্ধন সূত্রে বন্ধন করছি। হে রক্ষাবন্ধন তুমি অচল হয়ে থেকো।

উপাখ্যানটি হলো, বিষ্ণু বলিরাজার থেকে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করে সমগ্র স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করে নেন। বলিরাজাও বিষ্ণুকে পাতালে নিজের সঙ্গে থাকার অনুরোধ করলে ভক্তবৎসল বিষ্ণু তা স্বীকার করে নেন। লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুকে সেই পাতাল বাস থেকে মুক্ত করতে বলিরাজাকে রক্ষাসূত্র বেঁধে তাঁর স্বামীর মুক্তি কামনা করেন। বলিরাজাও বিষ্ণুকে মুক্তি দিয়ে গোলোক বা বৈকুণ্ঠপুরীতে ফিরে যেতে দেন।

ত্রেতাযুগে মহর্ষি বাল্মীকি লব-কুশের হাতে মন্ত্রপূত কুশের অগ্রভাগ (কুশ) ও নিম্নভাগ (লব) পরিয়ে দিয়ে রক্ষাবন্ধন করেন।

দ্বাপরযুগে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের হাতে এবং কুন্তী সদ্যোজাত অভিমন্যুর হাতে মঙ্গল কামনায় রক্ষাবন্ধন করেছিলেন। পৌরাণিক ঘটনায় দেখা যায়, দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রানী দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে রাখি বেধে যুদ্ধে পাঠিয়ে ছিলেন। শোনা যায়, ভারতের রাজা পুরুকে

রক্ষাসূত্র পাঠিয়ে নিজের স্বামীর কল্যাণ প্রার্থনা করেছিলেন আলেকজাণ্ডারের স্ত্রী এবং সেই প্রার্থনা মনে পড়ায় পরাজিত আলেকজাণ্ডারকে হত্যা না করে পুরু ছেড়ে দেন।

মধ্যযুগে চিতোরের রানি কর্ণাবতী গুজরাটের সুলতান বাহাদুর সাহেব আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রার্থনা করে রাখি পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রার্থনা স্বীকার করে হুমায়ুন চিতোর পৌঁছানোর আগেই নবাব বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করে। সম্মান রক্ষার জন্য রানি জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন দেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী ও মেবারের মহারানা রাজসিংহের মধ্যে রাখি বিনিময়ের কাহিনি ঐতিহাসিক মর্যাদা পায়। রানি চঞ্চলকুমারীর আহ্বানে তথা তাঁর প্রেরিত রাখির সম্মান রক্ষার্থে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে রাজসিংহ অস্ত্র ধারণ করেছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবকে পরাজিত করেন।

দক্ষিণ ভারতে এই দিনে দেবতার উদ্দেশ্যে নারকেল উৎসর্গ করা হয়। সেখানে এই তিথি 'নারিয়েল পূর্ণিমা' নামেও খ্যাত। দিল্লি ও উত্তম-পশ্চিম ভারতে এটি 'সেলোনো' নামে পরিচিত।

রাখির যে একটি উদ্দীপনাময় ঐক্যসূত্র আছে, সেটি অনুধাবন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাকে দু'ভাগ করার চক্রান্ত করে ইংরেজরা। গর্জে ওঠে আপামর বাঙ্গালি সমাজ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে রদ করার জন্য রাখিবন্ধনের পরিকল্পনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেদিনটি ছিল ৩০ আশ্বিন তথা ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫। রবি ঠাকুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবাই সেদিন গেয়েছিলেন, 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল। পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।'

সেদিনের সেই রাখিবন্ধন এনেদিয়েছিল বঙ্গে এক নতুন স্রোত। যার পরিণতি লর্ড হার্ডিঞ্জেরে সময় ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ। বাঙ্গলার মানুষ লর্ড কার্জনের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অরন্ধনের পরিকল্পনা করেন। স্ত্রীজাতিকে উদ্বুদ্ধ করে আন্দোলনে সামিল করার জন্য তিনি রচনা করলেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। এছাড়াও এর প্রতিবাদে সামনে এসেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ। ইংরেজদের 'Settled fact'-কে 'unsettled' করে দিতে সক্ষম হয়েছিল রাখি। একজাতি, একপ্রাণ, একতার মন্ত্রে ভারতবাসী উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিল। সেদিন শুধু অত্যাচারী ব্রিটিশ কেন সারা বিশ্ববাসীকে আমরা স্তম্ভিত করে দিয়েছিলাম। রাখির রঙিন সুতো হাতে বেঁধে সেদিন বঙ্গের মানুষ দেশমাতৃকার অখণ্ডতা রক্ষার শপথ নিয়েছিল।

হিন্দুসমাজ অনাদি কাল হতে এই বিশ্বে বিরাজমান। কালের আবর্তে কিছু দোষ-ত্রুটি এসেছে। যদিও-বা যুগে যুগে বুদ্ধ, জৈন, শঙ্করাচার্য, বিদ্যারণ্য, কবির, নানক, রামদাস, চৈতন্য, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাত্মারা এই ধর্মকে সতত পরিশুদ্ধ করেছেন। এদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মানুষের আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, খাদ্যাভ্যাস, ভাষার ভিন্নতা রয়েছে। উপাসনা পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। জীবন-জীবিকার প্রকৃতি অনুসারে বেদের যুগ থেকেই কর্মের ভিত্তিতে 'চতুর্বর্ণ' শ্রেণী-বিভাজন রয়েছে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের অজ্ঞতার কারণে কর্মের ভিত্তিতে সেই শ্রেণী বিভাজনকে জন্মের ভিত্তিতে জাতিবিভাগ হিসেবে স্থির হলো। এটি শুধু অশাস্ত্রীয়ই নয়, অনৈতিকও বটে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কথা—

‘চতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ’ ভুলে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জালে জড়িয়ে পড়লাম। ফলে বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট হিন্দুসমাজ ছোঁয়া-ছুত, উঁচু-নীচু শ্রেণীতে বিভাজিত হয়ে একে অপরকে ঘৃণা করতে শুরু করল, এর ফলে বীরত্ব ও পরাক্রমে অপরাজিত দেশ আমাদেরই অনৈক্য ও মনান্তরের কারণে বিদেশি বিধর্মীদের কাছে পরাজিত হলো। এলো বিদেশি শাসন।

ফলস্বরূপ হিন্দুধর্ম, মন্দির ও মাতৃজাতি চূড়ান্ত অপমানিত হলো। বিধর্মী শাসকের অত্যাচারের ভয়ে, প্রলোভনে এবং হিন্দুসমাজ জাতিভেদের নির্মম অপমানে আমাদের ভাই-বোনেরা বিধর্মীদের ধর্ম গ্রহণ করল। ধর্ম পরিবর্তনের ফলে তাদের জাতীয়তারও পরিবর্তন ঘটল, এদেশের মধ্যে একাদল দেশপ্রেমহীন। দেশবিরোধী অধিবাসীর জন্ম হলো। ধীরে ধীরে এক সময়ের গান্ধার আজ আফগানিস্তান (৮৩২ সাল), ব্রহ্মদেশ আজ মায়ানমার (১৯৩৭), সিংহল আজ শ্রীলঙ্কা (১৯৩৭), ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ) এবং ১৯৫২ সালে তিব্বতের জন্ম হলো। এর সুদূর প্রসারী প্রভাবে আজও দেশ ভাঙার চক্রান্ত অব্যাহত। কোথাও-বা মুসলমান উগ্রপন্থা, লাভ জিহাদ, জমি জিহাদের মাধ্যমে মোগলিস্তান তৈরির চক্রান্ত অব্যাহত। কোথাও-বা Breaking India-র এজেন্টরা সক্রিয়। একসময় ভারত ছিল ‘সোনে কি চিড়িয়া’। শিক্ষা, সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বীরত্বে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমাদেরই অনৈক্যের ফলে ৮০ লক্ষ বর্গকিলোমিটারের দেশ আজ কমে ৩০ লক্ষ বর্গকিলোমিটারে পৌঁছেছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সমাজে প্রচলিত বহু উৎসবের মধ্যে সেই ছয়টি উৎসবই পালন করে যার মধ্যে ভারতবর্ষের অতীত গৌরব-বিজয় এবং পরম্পরা রয়েছে; যে উৎসব ভারতীয় তথা হিন্দু সমাজ জীবনকে সংহত ও গৌরবান্বিত করে; ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য প্রকটিত করে এবং সকলের মনে বিজিগীষু মনোবৃত্তি জাগায়। দেশের নাগরিকের মধ্যে সুতীব্র জাতীয়তাবোধ জাগরণ প্রয়োজন। এই জাতীয়তাবোধ দেশবাসীর মনে সৃষ্টি করবে তীব্র স্বদেশানুরাগ, দেশের ঐতিহ্য বিষয়ে গর্ব ও শ্রদ্ধাবোধ তথা দেশের জন্য সবকিছু সমর্পণের মনোভাব আর দেশবাসীর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। এইসব কাজগুলিই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার সৃষ্টিলগ্ন থেকে করে চলেছে।

আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (জমি, বাড়ি) দখল হলে আমরা লড়াই করি। কিন্তু বিদেশি শত্রু রাষ্ট্রের সম্পত্তি আক্রমণ করে দখল করতে উদ্যত হলে আমরা উদাসীন থাকি। ‘তাতে আমার কি?’—এই মনোভাব আমাদের গ্রাস করে। ভুললে চলবে না— আমাদের পরিচয় আমাদের রাষ্ট্রীয়তায়। রাষ্ট্রীয় চরিত্রের অভাব হলে দেশের অপরিসীম ক্ষতি। আমাদের চরিত্রে রাষ্ট্রধর্মের অভাব ছিল বলেই আমরা ৮০০ বছর মুসলমান এবং ২০০ বছর ইংরেজদের কাছে পরাধীন ছিলাম। এই রাষ্ট্রধর্ম জাগরণের কাজই করে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এর একটি মাধ্যম হলো রাখিবন্ধন।

দেশের প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজনে সহস্রমস এক সূত্রে গেঁথে সহস্রজীবন উৎসর্গের শপথ নেবার উৎসব রাখিবন্ধন। ধর্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, রাষ্ট্ররক্ষার অঙ্গীকারের উৎসব এই রাখীবন্ধন। পরস্পরকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই আমরা রাখি বাঁধি। এই রাখি শুধু একটুকরো সুতো নয়। এ হলো রাষ্ট্র রক্ষাসূত্র। সম্প্রীতি রক্ষাসূত্র, দেশের অখণ্ডতা রক্ষার সূত্র। সমাজের সুরক্ষা নির্ভর করে সমাজের পারস্পরিক ঐক্য ও সংগঠনের ওপর। সমাজের মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য সমাজে একতা ও সংগঠন সম্ভবপর হয়। সঙ্ঘকাজের আধার হলো সমাজের প্রতি অকুণ্ঠ অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসা-ভক্তির ভাব। তাই আমরা বলি—

‘প্রাতঃ প্রভৃতিঃ সায়াহ্নম্ সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ
যৎ করোমি রাষ্ট্রমাতঃ তদন্ত এবপূজনম্।।’

অর্থাৎ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত, হে রাষ্ট্রমাতা, আমি যাই সরি না কেন, তা যেন তোমারই পূজা হয়ে ওঠে।

যারা এই দেশকে পুণ্যভূমি, কর্মভূমি, স্বর্ণভূমি, ধর্মভূমি বলে মনে করে— এই দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের। বর্তমান যুবসমাজ এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ হিন্দুরাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে ধর্মাশ্রিত। রাখিবন্ধন উৎসব পারস্পরিক ঐক্যবোধকে সুদৃঢ় করে সেই পথকে প্রসারিত করেবে। বলা হয়—

‘দেশরক্ষা সমং পুণ্যং দেশরক্ষা সমং ব্রতম্
দেশরক্ষা সমোভাবে দৃষ্টো নৈব চ নৈব চ।।’

—দেশ রক্ষার সমান পুণ্য, দেশ রক্ষার সমান ব্রত এবং দেশ রক্ষার সমান বদ্ধ দেখা যায় না, তাই দেশরক্ষাই সর্বোত্তম কাজ।

আমরা একতাবদ্ধ, জাতপাতহীন, ভেদাভেদ মুক্ত, সমরসতাযুক্ত, শক্তিশালী, সমৃদ্ধ দেশ পুনর্নির্মাণ করতে চাই। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলীরাম হেডগেওয়ারের কথায় এমন দেশ ‘যার দিকে বাঁকাচোখে কেউ তাকাতে সাহস পাবে না।’ সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী ১৯৬৯ সালে মন্ত্র দিয়েছেন— ‘হিন্দবঃ সোদরা সর্বে ন হিন্দুঃ পতিতো ভবেৎ/মমদীক্ষা হিন্দুরক্ষা মম মন্ত্র সমানতা।’ সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজী পথ দেখিয়েছেন, ‘যদি অস্পৃশ্যতা পাপ না হয়, তাহলে পৃথিবীতে পাপ বলে কিছু নেই।’ ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত বনবাসী কল্যাণ আশ্রম বনবাসী, গিরিবাসী, জনজাতি ভাইদের সমাজের লস্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় রত।

রাখির দিনে নিজের সংস্কৃতি রক্ষার সংকল্প করতে হবে। দরকার সমাজের সুরক্ষা। সমাজ সুরক্ষিত হলে তবেই দেশের বিকাশ হবে। বিকাশের প্রথম ধাপ হলো সব বিষয়ে সুরক্ষা। বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতজী বলেছেন— বহিঃশত্রু, অর্ন্তশত্রু থেকে সুরক্ষা, রোগ অসুখের থেকে সুরক্ষা, খাদ্যসুরক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষা, দেশের অর্থব্যবস্থার সুরক্ষা এবং জল-জমি-জঙ্গল-বন্যপ্রাণ সকলের সুরক্ষা দরকার।

আসুন আমরা সকলে মিলে জাতির স্বার্থে, দেশের স্বার্থে রাখির অন্তর্নিহিত ভাবকে গ্রহণ করে স্বদেশ আরাধনার ব্রতী হই। ‘ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ’ —স্বামীজীর এই কথাটিই হোক আমাদের আপ্তবাক্য। ■

ঝুমকোলতার নান্দনিকতার মধ্যেই আসে রাখিপূর্ণিমা

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

রাখিবন্ধন-মরসুমেই ফোটে ঝুমকোলতা ফুল, আর দেখতেও একটা রাখিরই মতো। এই ফুলের আদলেই হয়তো প্রথম রাখিটি তৈরি হয়েছিল। কেবল হাতের গয়না নয়, এই ফুলের অনুকরণে তৈরি হয়েছে কানপাশাও, তার নাম ঝুমকা; আর তা থেকেই গাছের নাম হয়ে গেল 'ঝুমকোলতা'। রাধা-কৃষ্ণ নামের সঙ্গে এই ফুল জড়িয়ে আছে, জড়িয়েছে পঞ্চ-পাণ্ডবের নামও। ফুলের নাম 'কৃষ্ণকমল' ; 'রাধিকা নাচন', 'পঞ্চপাণ্ডব'।

ইংরেজিতে ফুলের নাম Passion Flower বা Passion Vine. উদ্ভিদবিদ্যাগত নাম Passiflora, তার নানান প্রজাতি; কোনোটি নীল (caerulea), কোনটি বেগুনি (incarnata), কেউ-বা লাল (racemosa) কিংবা রক্তাভ (coccinea), আবার কোনোটি গোলাপি (kermesina)। এটি Passifloraceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত; কখনও তা ছাপিয়ে শরৎ-হেমন্তের প্রভাতবেলা। রবি ঠাকুরের সেই বালক-বেলার কবিতাটিই আমার মনে পড়ে, 'হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে/ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে/বাদল বেলার কথা,/ হারিয়ে পাওয়া আলোটিরে/নাচায় ডালে ফিরে ফিরে/ঝুমকো ফুলের লতা।' কবিতাটিতে উদ্যানবিদ রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, এ রোদ-পিয়াসী ফুল।

বিশ্বের কিছু ডাকটিকিটে রয়েছে রাখিফুলের নান্দনিকতা। তাতে যে কটি প্রজাতির অমল-শোভা ধরা পড়েছে, তা এইরকম—ইকুয়েডরের প্রজাতিটি arborea, সুরিনামের প্রজাতি laurifolia, উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনার প্রজাতি caerulea, পোলাস্কা ও গ্রানাডার প্রজাতি quadrangularis, মন্টসেরাটের প্রজাতিটি alata এবং amabilis, নিউই-র প্রজাতি edulis, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড ও নিকারাগুয়ার

আদিনিবাস সম্ভবত পুরাতন পৃথিবী (Old World অর্থাৎ Afro-Eurasia)। ৫০০টির মতো প্রজাতি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে; তার অধিকাংশ মেক্সিকো-সহ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় লভ্য, হয়তো তা ছড়িয়েছে পুরাতন বিশ্ব থেকেই; কিছু ছড়িয়ে আছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও ওসিয়ানিয়ায়। ফুলের সৌকর্যে মাতোয়ারা হয়ে এই ফুলটি এদেশ-ওদেশ ছড়িয়ে গেছে এবং নতুন জলবায়ুতে তা দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে।

গাছটি শক্তপোক্ত লতানে, বহুবর্ষী, তাতে রয়েছে আকর্ষের মতো আরোহী, যা বনস্পতি বেয়ে উঁচুতে যেতে চায়, প্রথম পেতে চায় প্রভাতের সূর্যকিরণ। রোদ ঝলমলে স্থান পছন্দ করে এরা, ছায়া-নিবিড়তা না-পসন্দ নয়। এর পাতাগুলিও যেন 'কথা'। প্রাচীর জুড়ে, বাঁশের বেড়ার উপর চড়িয়ে দিলে ডগমগে পাতার যৌবন ডালে ডালে নাচিয়ে প্রভাতের সূর্যকে যেন নিত্যদিনই রাখি পড়ায়! গ্রীষ্মের শেষ থেকে সারা বর্ষা, প্রজাতি foetida, এছাড়াও বারমুডা, নেভিস, ভিয়েতনামের মতো কয়েকটি দেশও Passion flower নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

ছোটোবেলায় তিনদিন ঝুলন সাজাতাম, পূর্ণিমার দিন রাখি পড়াতো বোন। দুর্গাপূজার দিন গোনা ছাড়া, বাকি উৎসবগুলো হঠাৎ করেই চলে আসতো আমাদের জীবনে। কত রকমের পালাপার্বণ, তিথি পূজা! এক পূজা যায়, আর পূজা আসে। মা ব্রত রাখেন। এ বাড়ি ও বাড়ি যায়; যে বাড়ি যে পূজার জন্য বিখ্যাত, যাওয়া চাই-ই সেখানে। আমরা কচিকাঁচারা তন্নতন্ন করে খুঁজি? কী? এখন মনে হয়, 'বঙ্গের সংস্কৃতি', 'ঐতিহ্যের শিকড়'।

রহড়া খড়দায় ঝুলনের আয়োজন তখন সব বাচ্চারাই করতো। আমি আর বোনও ঝুলনা সাজাতাম— মস-ফার্ন, বালি-সুরকি, ঝামা ইঁটের ছোট্ট পাহাড়, অর্ধ চন্দ্রের উপর রাধাকৃষ্ণের মৃন্ময় মূর্তি। সেই পূর্ণিমার বিকেলেই ডান হাতের কবজিতে বোন পরিয়ে দিত সুদৃশ্য রাখি। বিকেল

থেকে রাত অবধি আগলে রাখতাম অলংকার। তারপর যত্নে কাগজের বাক্সে তুলে রাখতাম, আশ্বিন সংক্রান্তিতে আবার পড়বো। রাখির জোগান দিতেন দিদি আর ছোড়দি ; টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে। এ দোকান, ও দোকান ঘুরে বেছে বড়োসড়ো রাখি খুঁজে আনতেন দিদি-ছোড়দি। প্রথমে স্পঞ্জের পাতলা চক্রের ভিত্তি, তার উপর ভেলভেটে চুমকি বসানো এক টুকরো গোল কাপড়, মাঝে মানানসই প্লাস্টিকের ছোটো জল-শিউলি ফুল— পুরোটাই সুতো দিয়ে সুন্দর করে কেন্দ্রে গাঁথা। আমাকে আর দাদাকে পড়ানো হতো রাখি। দিদি শাঁখ বাজাতেন, ছোড়দি চন্দনের টিপ।

বোন ছোট্ট, তারও যে একটা রাখি চাই! আহা বলতেও পারে না। ফ্যালফ্যাল করে রাখির দিকে চেয়ে থাকে পড়ানোর পর, এক এক করে চুমকি গোনে। আদর করে আর একটি রাখি এবার দিদিই পরিয়ে দেন বোন্টুর হাতে। ওটাও কেনা থাকে। দিদি জানে, বোনের কষ্ট হবে। তারপর প্রত্যেক একটি করে রসগোল্লা খাই; পাঁচ ভাই-বোন। রহড়া বাজারে মানিক ঘোষের দোকানে রসগোল্লা তখন চার আনা পিস। এটাই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের কচিকাঁচাদের কাছে তখন এক দামী ও সম্মানীয় খাবার।

তখনই জেনেছিলাম রাখিফুলের কথা। যে বাড়িতে ঝুমকোলতার ফুল ফোটে ভাই-বোনকে হাত ধরে সেই বিকেলেই নিয়ে যায় দিদি। বেড়ার উপর ঝুমকোলতার ছড়ানো সবুজ চাদর, মাঝে মাঝে উঁকি মারছে এক একটি স্বর্গের ফুল, ভারি মিষ্টি তার গন্ধ। 'ফুলগুলি যেন কথা, /পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার/পুঞ্জিত নীরবতা।।' আগ্রহে, উৎসাহে, আতিশয্যে ফুল নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে ছিঁড়েই ফেলি কোনো একটা। ফুল্লরার মালিক বলেন, ছিঁড়তে নেই বাবা, ফুল গাছেই যে ভালো লাগে! কিন্তু আমার যে দেখতেই হবে ফুলের প্রতিটি অবয়ব! কেমন তার নরম দলের উপর পুংকেশর-গর্ভকেশরের মনোরম নিখুঁত ছবি আঁকা রয়েছে! স্রেফ অঙ্কন করেই সাজিয়ে দিয়েছেন বনমালি! আমি রাখিফুল দেখছি তো দেখছিই! দীর্ঘ অবলোকনের পর বোনকেই দিয়ে দিতাম সেই মহার্ঘ্য ফুল। ছোট্ট- মিষ্টির মুখ নিমেষে আনন্দ ভরে ওঠে। এ ফুল ওকেই মানায়! পরিবারে মিষ্টি এক ফুল।

রাখিবন্ধনকে অন্যতর তাৎপর্যে নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে গিয়ে বিধুবাবুর কাছে শুনলাম তার ইতিহাস। এক বর্ষাস্নাত রাখিবন্ধন উৎসবে 'হিন্দুমহাসভা ধাম'-এর দোতলার বারান্দায় বসে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ও রাণী চন্দের 'ঘরোয়া' গ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনালেন, রাখিবন্ধন উৎসবের কথা। তারই কিয়দংশ পরিবেশন করছি---

'রবিকাকা একদিন বললেন, রাখিবন্ধন-উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখি পরাতে হবে। উৎসবের মন্ত্র অনুষ্ঠান সব জোগাড় করতে হবে, তখন তো তোমাদের মতো আমাদের আর বিধুশেখর শাস্ত্রীমশায় ছিলেন না, ক্ষিতিমোহনবাবুও ছিলেন না কিছু একটা হলেই মন্ত্র বাতলে দেবার। কী করি, থাকবার মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রমোহন কথক ঠাকুর, রোজ কথকতা করতেন আমাদের বাড়ি, কালো মোটাসোটা তিলভাণ্ডেশ্বরের মতে চেহারা। তাঁকে গিয়ে ধরলুম, রাখিবন্ধন-উৎসবের একটা অনুষ্ঠান বাতলে দিতে হবে। তিনি খুব খুশি ও উৎসাহী হয়ে উঠলেন, বললেন, এ আমি পাঁজিতে তুলে দেব, পাঁজির লোকদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, এই রাখিবন্ধন-উৎসব পাঁজিতে থেকে যাবে। ঠিক হলো সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখি পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব— রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়িঘোড়া নয়। কী বিপদ, আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না। কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছু শুনবেন না। কী আর করি— হেঁটে যেতেই যখন হবে, চাকরকে বললুম, নে সব কাপড়-জামা, নিয়ে চল সঙ্গে। তারাও নিজের নিজের গামছা নিয়ে চলল স্নানে, মনিব চাকর একসঙ্গে সব স্নান হবে। রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে— মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম— যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

এই গানটি সে সময়েই তৈরি হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হলো— সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এক গাদা রাখি, সবাই এ ওর হাতে রাখি পরালুম। অন্যরা যার কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখি পরানো হলো। হাতের কাছে ছেলে-মেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখি পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলান, মুসলমানকে রাখি পরালে— এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখি পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চিৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখি পরাবেন। হুকুম হলো, চলো সব। এইবারে বেগতিক— আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখি পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না। তার উপর রবিকাকার খেয়াল, কোথা দিয়ে কোথায় যাবেন আর আমাকে হাঁটিয়ে মারবেন। আমি করলুম কী, আর উচ্চবাচ্য না করে যেই-না আমাদের গলির মোড়ে মিছিল পৌঁছানো, আমি সট্ করে একেবারে নিজের হাতার মধ্যে প্রবেশ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। রবিকাকার খেয়াল নেই— সোজা এগিয়েই চললেন মসজিদের দিকে, সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন, আরও সব ডাকাবুকো লোক।

এদিকে দীপুদাকে বাড়িতে এসে এই খবর দিলুম, বললুম, কী একটা কাণ্ড দেখো। দীপুদা বললেন, এই রে, দিনুও গেছে, দারোয়ান দারোয়ান, যা শিগগির, দেখ্ কী হলো— বলে মহা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন। আমরা সব বসে ভাবছি— এক ঘণ্টা ক দেড় বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী, কী হলো সব তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, বললে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতরে, মৌলবি-টৌলবি যাদের পেলুম হাতে রাখি পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম, আর মারামারি! সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে— ওরা একটু হাসলে মাত্র। যাক্, বাঁচা গেল। এখন হলে— এখন যাও তো দেখি, মসজিদের ভিতরে গিয়ে রাখি পরাও তো— একটা মাথা-ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে।' ■

প্রকৃতি-পরিবেশ-অরণ্য এবং বন্যপ্রাণ রক্ষা

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

সৃষ্টির আদিকাল হতেই বিশ্বজুড়ে 'প্রকৃতি' স্বয়ং দেবীরূপে আবির্ভূতা। 'অরিজিন অফ লাইফ' তত্ত্বের উদ্গাতা বৈজ্ঞানিককুল সৃষ্টির আদি হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময় বা কালের চলমান ধারাকে 'জিওলজিকাল টাইম স্কেল' বলে চিহ্নিত করেছেন। সময়ের এই চলন্ত সরণি বেয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ভূপ্রকৃতি বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে একটি মহাদেশ ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক মহাদেশ, একটি মহাসমুদ্র খণ্ডিত হয়েছে একাধিক মহাসাগরে। নিত্য পরিবর্তনশীল এই জগতে সৃষ্টি হয়েছে অগণিত প্রাণী, অসংখ্য উদ্ভিদ। প্রাণী-উদ্ভিদ-সহ আরও কিছু জীবের সমন্বয়ে 'জীবকুল' তার সমগ্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রকৃতির বুকে বিরাজমান এই জীবকুলের আভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক মিথোস্ক্রিয়া সৃষ্টি করেছে পপুলেশন (বিভিন্ন জীব-প্রজাতির সংখ্যা), কমিউনিটি (অনেক জীবের পারস্পরিক সমন্বয় এবং তাদের মধ্যে জৈবনিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াজাত আদান-প্রদানে সৃষ্ট একটি জীব- সমবায়), ফুড চেন ও ফুড ওয়েব (খাদ্য-শৃঙ্খল)। প্রকৃতির সঙ্গে জীবকুলের এই মিথোজীবিতা সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র। বিশ্বময়-স্থিত সার্বিক বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে প্রাণী-উদ্ভিদ-সব সমগ্র জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান। বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল বা জীবভূরাসায়নিক চক্রের মাধ্যমে প্রাণবন্ত জীবকুলের সঙ্গে বায়ুমণ্ডল, ভূত্বক বা পৃথিবীর মাটির মেলবন্ধন হয়ে চলেছে। যার ফলে পৃথিবীতে স্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক মৌল নানা রাসায়নিক যৌগে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে কখনও জীবের রূপ ধারণ করছে, কখনও মাটি-বায়ুতে লীন হয়ে চলেছে এবং সৃষ্টি-চক্রকে অনন্ত কাল ধরে অব্যাহত রাখছে। নির্দিষ্ট ধরনের জলবায়ু, প্রাণী ও উদ্ভিদ সংবলিত বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চল হলো বায়োম (অর্থাৎ, জীবাঞ্চল বা বাস্তুসংস্থানিক অঞ্চল)। দেবী-স্বরূপা বিশ্ব-প্রকৃতির এই অমোঘ, অপার লীলার ফলাফল বা অন্যতম দান হলো পৃথিবীর বুকে ভারতবর্ষের অভ্যুদয়।

সুপ্রাচীন কালে বিশ্বের বুকে ভারতবর্ষের এই সুমহান আবির্ভাব সূচিত করেছে প্রকৃতি-পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্রের এক চিরন্তন যাত্রা। জৈবিক অভিযোজন (অ্যাডাপ্টেশন) ও পরিব্যক্তির (মিউটেশন) হাত ধরে প্রকট হচ্ছে অভিব্যক্তি (ইভোলিউশন)। বিবর্তিত হয়ে চলেছে জীবকুল। এই জীবজগতের ওপর কাজ করছে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল সিলেকশন। যুগ-যুগান্তরে প্রাকৃতিক ভাঙাগড়ায় কখনও এসেছে বিপর্যয়, কখনও হয়েছে নতুন জীব-প্রজাতির সৃষ্টি। বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্মিলিত সহাবস্থানে সমগ্র ভারতজুড়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ক্ষেত্রসমূহে সৃষ্টি হয়েছে জীব-সমবায় (কমিউনিটি) সমন্বিত ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র। এই বাস্তুতন্ত্রসমূহে প্রতিটি জীবের অবস্থান বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের অস্তিত্বের সংকট উপস্থিত হলে, কোনো একটি বা একাধিক প্রজাতি অবলুপ্ত হলে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের ওপরেই কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে থাকে জীববৈচিত্র্য, বিপর্যস্ত হতে থাকে পরিবেশগত ভারসাম্য।

জিওলজিকাল টাইম স্কেল অনুযায়ী মেসোজোয়িক যুগ শেষের পর সিনোজোয়িক যুগ শুরু হয়। আনুমানিক ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে এই যুগের সূত্রপাত হয়। 'সিনোজোয়িক' শব্দের অর্থ— 'নিউ লাইফ' বা 'রিসেন্ট লাইফ'। বর্তমান সময়ের জীব-বৈজ্ঞানিক রেখাপাত হলো এই যুগ। ভয়াবহ উল্কাপাত, ভূমিকম্প, দীর্ঘ তুষারপাত (গ্লেসিয়েশন), আগ্নেগিরির অগ্ন্যুৎপাত, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগের সাক্ষী থেকেছে এই যুগ। প্রতিটি বিপর্যয়ের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদের অবস্থান নানাভাবে এলোমেলো হয়ে যায়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থান। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের এই চিরকালীন ভাঙাগড়ায় দেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, অরণ্যাঞ্চল, তৃণভূমি, মরুভূমি, জলাভূমি, নদ-নদী ও মোহনা। ভূবৈচিত্র্যগত এই বিভিন্ন ভৌগোলিক জীবাঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

অনাদি কালে ভারতের বুকে রচিত হয়েছে বেদ ও উপনিষদ। বৈদিক ঋষিরা বিশ্বপ্রকৃতি ও সমগ্র জীবকুলের মাঝে মানবজগৎকে রক্ষায় প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন।

সৃষ্টিকে রক্ষার লক্ষ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আরোপ করেছিলেন সর্বাধিক গুরুত্ব। দার্শনিকসুলভ দূরদৃষ্টির অধিকারী প্রাচীন ব্রহ্মবিদরা ধরিত্রী রক্ষায় তাঁদের তরফে ঘটিয়েছেন আর্যপ্রয়োগ। বৈদিক যুগে সমগ্র ভারতবর্ষ গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল। বেদে অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'অরণ্যানী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। বন্যপ্রাণ সংবলিত অরণ্যাঞ্চল রক্ষা পেলে মানবসমাজ ও সমগ্র সৃষ্টি রক্ষিত হবে; পৃথিবীর ফুসফুস রক্ষা পেলে দূষিত বায়ুমণ্ডলের হাত থেকে পরিত্রাণ ঘটবে; বিশ্ব জুড়ে বনসৃজন হলে— অরণ্যসমূহ 'অভয়ারণ্য'-এ পরিণত হলে, বনজ সম্পদের সুষম ব্যবহার হলে প্রকৃতি-বান্ধব অর্থনীতির বিকাশ হবে এই সত্য এবং এই তত্ত্ব দূরদর্শী ঋষিরা সমগ্র মানবজগৎকে দান করে গিয়েছেন। 'বন সংরক্ষণ'-এর লক্ষ্যে যাবতীয় প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা দেবী অরণ্যানীর উপাসনা। বনের বিভিন্ন বৃক্ষ এই কারণে পবিত্র, বিভিন্ন বন্যপ্রাণী দেবদেবীদের বাহনের মর্যাদা লাভ করেছে। এর মাধ্যমে নির্বিচারে অরণ্য ও বনপ্রাণ নিধন সুদীর্ঘ কাল ধরে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয়েছে। দেবদেবীদের পূজায় ব্যবহৃত হয়েছে নানা উদ্ভিদ। ভারতীয় প্রজাতির দুগ্ধদাত্রী গোরু হলো গোমাতা, যিনি সাক্ষাৎ দেবী-স্বরূপিণী। প্রকৃতির বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন না করে মানবোন্নয়নের এই রীতি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই ভারতীয় পদ্ধতি আজ বিশ্বময় একটি গবেষণার বিষয়।

ভারতের বনবাসী, জনজাতি সম্প্রদায় শালগাছ-সহ বিভিন্ন গাছপালা সমন্বিত একখণ্ড বনভূমিকে তাঁদের পূজ্য দেবদেবীর পবিত্র স্থান (বা থান) রূপে গণ্য করে থাকেন। বনভূমি-স্থিত বিভিন্ন নদী বা ঝরনার নানা অংশকেও তাঁরা পবিত্র জ্ঞানে পূজা করে থাকেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতমে বর্ণিত হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হ্লাদিনীশক্তি- স্বরূপীণী শ্রীরাধিকার সঙ্গে কুঞ্জবনে দোলনায় দোদুল্যমান ছিলেন। 'পবিত্র কুঞ্জবন'-এর উল্লেখের মাধ্যমে বর্ণিত এই উপাখ্যান বন সংরক্ষণের প্রতীক-স্বরূপ। শ্রীভগবানের এই লীলা অপরিসীম গুরুত্বসম্পন্ন বনভূমি রক্ষায় সৃষ্ট ভারতীয় সংস্কারের তাৎপর্যবাহী। হিন্দুদের ত্রিসন্ধ্যা-আহ্নিক সূত্রাবলীতে উল্লেখিত হয়েছে নদীস্তোত্র। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী নদীকে এই স্তোত্রের মাধ্যমে দেবীর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তাঁদের জলকে পবিত্র ও স্বর্গীয় বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং এই দেবীদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়েছে। জলদূষণ রোধে, নদ-নদী সংরক্ষণে অনুসৃত এই ভারতীয় প্রণালী আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সনাতনী, হিন্দু ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ভগবান শিব হলেন সমস্ত বন্যপ্রাণী ও গৃহপালিত প্রাণীদের দেবতা। তিনি হলেন পশুপতিনাথ। সিন্ধু নদ ও সরস্বতী নদীর তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় একটি শিলালিপিতে ভগবান পশুপতিনাথের নিদর্শন পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বনাঞ্চল-প্রসূত ভেষজ ওষধির ব্যবহার সর্বজনবিদিত, যা মানুষের প্রাণ রক্ষায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ভারতে আধ্যাত্মিক সাধনা ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজে প্রাণীকুল ও বনাঞ্চল সংরক্ষণের বার্তা প্রেরণের এই পদ্ধতি সত্যিই অভিনব।

ভারতের উত্তরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণী। এই পর্বতমালা বৈদেশিক আক্রমণ হতে ভারতকে রক্ষা করেছে, এই পর্বতমালা হতে নির্গত নদীসমূহ ভারতের বুকে জলসিঞ্চন করেছে। যার পরিণামে অব্যাহত থেকেছে কৃষিকাজ, খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়নি ভারত। হিমালয়, পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালার বুকে আশ্রয় পেয়েছে অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ। বিপুল এই জীববৈচিত্র্যের সমভিব্যহারে ধরিত্রীদেবী হয়ে উঠেছেন উৎকর্ষিণী। ১৯৮০ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী— গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু জুড়ে অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় অরণ্যভূমির পরিমাণ ছিল এক লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র ১৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল। জনসংখ্যার চাপে, মানুষের সীমাহীন লোভে, খনিজ পদার্থ উত্তোলনের উদ্দেশ্যে অবিরাম খনন কার্যের ফলে নির্বিচারে দেশ জুড়ে অরণ্যভূমি নিধন চলছে। পার্বত্য অঞ্চলের বহু স্থানে অপরিকল্পিতভাবে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু জায়গায় বনভূমিতে দাবানল দেশবিরোধী শক্তির চক্রান্তের ফলাফল। ১৯৭০-এর দশকে বনভূমি নিধন রোধে উত্তরাখণ্ডে সংঘটিত হয় চিপকো আন্দোলন। বনভূমির গাছকে জড়িয়ে ধরে স্থানীয় মহিলারা রোধ করেন অরণ্য নিধন। স্বাধীনতার আগে বাঘ, চিতা, হরিণ-সহ অন্যান্য বনপ্রাণ নির্বিচারে শিকার চলত। পরিণামে চিতার ভারতীয় প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্বাধীন ভারতে 'বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন'টি প্রণীত হলেও তার প্রয়োগ খুবই সীমিত। ফলে অব্যাহত রয়েছে চোরাশিকার। বন্যপ্রাণ পাচার চক্র সক্রিয় থাকার দরুন বিভিন্ন বন্যপ্রাণের সংখ্যাও প্রতিদিন কমছে। প্রাকৃতিক বাসস্থান ধ্বংসের কারণে সংকটাপন্ন জীব প্রজাতিসমূহ বিরল থেকে হয়ে উঠছে অতি-বিরল। ব্যাপক অরণ্য ধ্বংসের ফলে ঘটে চলেছে কেরালার ওয়েনাড়ের মতো ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা।

'কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায় পড়িছ নিখিল বিশ্বে।'

জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে, বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে দেশীয় প্রকৃতি-পরিবেশ, বনাঞ্চল, বন্যপ্রাণ, জলসম্পদ, বায়ুমণ্ডল রক্ষার শপথগ্রহণ ভারতবাসীর আজ আশু প্রয়োজন। অরণ্যের বুকে জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ পালন করেন রক্ষাবন্ধন। গাছগুলিকে রাখিবন্ধন করে তাঁরা বৃক্ষরক্ষার শপথগ্রহণ করেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে বনবন্ধু যুগলপ্রসাদকে দেখা যায়, যিনি বনাঞ্চলেই বনস্পতির চারা রোপণ করেন, জঙ্গলেই করে চলেন বনসৃজন। জঙ্গল কেটে ক্রমাগত জনবসতি স্থাপন ও চাষাবাদের ফলে একদা অরণ্যাবৃত দেশের মাটি আজ হয়ে উঠেছে উন্মুক্ত। দ্বীপাঞ্চলের বাদাবন সাফ করে বসতি স্থাপনের ফলে ঝড়-ঝঞ্ঝার দ্বার হয়েছে অবারিত। তাই বনভূমি ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশ জুড়ে অরণ্যাঞ্চল জুড়েই এই বর্ষাকালে প্রয়োজন ব্যাপক 'বনমহোৎসব'। রোপিত চারাগাছগুলিকেও দেখভাল করে সেগুলিকে পরিণত উদ্ভিদে রূপান্তরের দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের ওপরেই বর্তায়। রাখিবন্ধনের পবিত্র দিনে প্রকৃতি-পরিবেশের সার্বিক সুরক্ষার শপথগ্রহণ ভারতের বুকে হয়তো একদিন ফিরিয়ে আনবে ঋষিদের 'তপোবন'। পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসজনিত এই সংকটের যুগে দাঁড়িয়ে স্মরণে রাখতে হবে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের চিরায়ত ভারতীয় আদর্শ। সেই আর্যপ্রয়োগকে উপলব্ধি ও ব্যবহারের লক্ষ্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে চিরন্তন সত্য-স্বরূপ একটি আপ্তবাক্য— 'Nature protects, if she is protected' (অর্থাৎ, 'প্রকৃতি' রক্ষা করেন যদি তিনি সুরক্ষিত থাকেন)।

রাজ্যশ্রী থেকে রাজর্ষি মহারানি অহল্যাবাঈ

ড. সুনীতা শর্মা

ভারত অনেক সাধনার ফলে বিশ্বগুরু হয়েছে। এদেশের মা-বোনেরা ইতিহাসে এমন স্থান অর্জন করেছেন যাতে দেবতারাও হার মেনেছেন। মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকর নিজের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের জন্য বিশ্বের মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান অর্জন করেছেন যার ফলে জনমানসে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহিলা সংগঠন 'রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি' কর্তৃত্বের আদর্শ প্রতিমূর্তি হিসেবে মহারানি অহল্যাবাঈকে সামনে রেখেছে। বাল্যকালের সংস্কারের দ্বারাই ভবিষ্যতের রাস্তা তৈরি হয়। এই সংস্কারের জন্যই ভবিষ্যৎ উন্মুখ হয়। আহমদনগরের জামখেড় তালুকের চণ্ডী গ্রামের এক ছোটো অথচ সৌম্য শান্ত, তেজস্বিনী বালিকা মালোয়ার সুবেদার মলহার রাওকে নিজের ভক্তি ও ব্যবহারের দ্বারা খুশি করেছিলে এবং সে কারণেই তিনি তাঁর পুত্র খণ্ডে রাওয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন একেবারে মানকোজীর কাছে (অহল্যাবাঈ পিতা)।

বালিকাকে দেখে মলহার রাও বুঝে গেছিলেন যে এই সংস্কারিত বালিকা কুশল ব্যবহার ও সেবা ভাবনার দ্বারা সবার মন জয় করবেন এবং ক্রোধী, বিষয়াসক্ত পুত্র খণ্ডে রাওকে সঠিক পথে চালনা করবে। তাই করেছেনও। বালিকা অহল্যার মধ্যে আদর্শ ভারতীয় নারীর সবগুণ বিদ্যমান ছিল। সে তার-বিবেক, নম্রতা, সেবা, ত্যাগ ও সহনশীলতার দ্বারা স্বামীর মধ্যে আত্মগৌরব ও বীরভাব উৎপন্ন করতে পেরেছেন। ধীরে ধীরে অহল্যাবাঈয়ের মধ্যে রাজকার্য পরিচালনার রুচি জাগতে আরম্ভ করেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবারুদে, বন্দুক, কামান, খাদ্যদ্রব্য পাঠানোর দায়িত্ব নিতে আরম্ভ করেছেন। ইতিমধ্যে ১৭৪৫ ও ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মালেরাও ও মুক্তাবাঈ নামে দুই সন্তানের মা হয়েছেন।

ভরতপুরের যুদ্ধ তাঁদের পরিবারের কাছে একটা পরীক্ষার মতো এসে গেল। জাঠ ও মরাঠাদের মধ্যে যে ভয়ানক যুদ্ধ হলো তাতেই খণ্ডে রাওয়ের প্রাণ গেল। মলহার রাও পুত্রশোকে বিহ্বল হলেও অহল্যা সতী হতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল প্রাণাধিকপ্রিয় পতি বিনা বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। শ্বশুর মলহার রাও অনেক বোঝাবার পর সতী হওয়ার পণ ত্যাগ করেন এবং প্রজাদের মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করার দায়িত্ব নেন। 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'— এই আপ্তবাক্যকে মূলমন্ত্র করে রাজকীয় সুখ ত্যাগ করে দীনদুঃখীদের সেবাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন। কুশল শিক্ষক তথা শ্বশুর মলহার রাওয়ের শিক্ষায় ও তত্ত্বাবধানে শিষ্যা পুত্রবধূ অহল্যাবাঈ রাজকর্মে অনেকটা পটু হতে লাগলেন। মলহার রাও চেয়েছিলেন যে তাঁর জীবদ্দশাতেই পুত্রবধূ দেশ দুনিয়ার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক স্থিতির সঙ্গে পরিচিত হোক। যার জন্য তিনি পুত্রবধূকে দেশভ্রমণেও পাঠিয়েছিলেন। সমাজের সঙ্গে মিশলেই তবে সমাজকে চেনা যায়। এখন থেকে অহল্যাবাঈ নিজেই প্রজাদের ন্যায্য করব্যবস্থা ও সুখদুঃখের সমাধান করতে আগ্রহী হলেন। শ্বশুর মলহার রাও খুব কুশলী ছিলেন। যখনই কোনো যুদ্ধের জন্য রাজ্যের বাইরে ব্যাপ্ত থাকতেন, তখন পত্রের মাধ্যমে পুত্রবধূকে বিভিন্ন উপদেশ দিতেন।

অহল্যাবাঈকে আশীর্বাদ : ৩ জানুয়ারি ১৭৬৫ আগ্রা থেকে মলহার রাও পুত্রবধূকে লিখছেন— 'আমি তোমাকে আগের চিঠিতে লিখেছি তুমি সোজা গোয়ালিয়র পৌঁছে যাও। ওখানে ৫-৭ দিন থাক। সেখানে ১০০০ না হলে কমপক্ষে ৫০০ বড়ো কামানের জন্য গোলা বানাও, সম্ভব হলে ছোটো বন্দুকের গুলি তৈরি করাও। নিজের পছন্দমতো ১০০টি বড়ো পাত্র কিনে নাও যেগুলোতে একসের মতো তিরের পাউডার রাখা যাবে। এই কাজ খুব দ্রুত করতে হবে। আমি তোমাকে আগেও ছোটো কামানের বিষয়ে লক্ষ্য দিতে বলেছিলাম, অস্ত্র বানানোর জন্য একমাসের খরচ চালানোর মতো অর্থ মজুত রাখো।

কর্তব্যনিষ্ঠা ও মমতাময়ী : ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে হোলকর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, মরাঠা রাজ্যের ভীষ্ম পিতামহ স্বরূপ মলহার রাওয়ের জীবনাবসান হলো। তিনি ছিলেন ওই রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ, পরাক্রমী ও শক্তিশালী। ফলে রাজ্যের উপর বিরাট

আঘাত এল। প্রথমে স্বামী ও পরে পিতৃতুল্য শ্বশুরের পরলোকগমনে অহল্যাবাঈ খুব ভেঙে পড়লেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে পুত্র মালেরাও মালোয়া রাজ্যের সিংহাসনে আসীন হলেন। অহল্যাবাঈ সর্বদা পুত্রের ব্যবহারের জন্য চিন্তিত ছিলেন। মালেরাও প্রজাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন এবং ব্রাহ্মণদের যে দান (অন্ন, মিষ্টি) দেওয়া হতো তার মধ্যে সাপ, বিছা ইত্যাদি রেখে দিতেন। প্রজারা ভয়ে ভয়ে থাকত। বংশের সুনাম ধূলায় মিশিয়ে যাচ্ছিল। বারবার সাবধান করার পরেও পুত্রের স্বভাবের কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল না। একজন ধর্মনিষ্ঠ, সনাতনী, সংস্কারিত মা এবং এক রানির কাছে এক কঠিন পরীক্ষার ক্ষণ এল। কিন্তু তাঁর বড়ো পরিচয় লোকমাতা হিসেবে। প্রজাদের কল্যাণের কথা ভেবে কর্তব্যনিষ্ঠ রানিমা পুত্র মালেরাওকে হাতির পায়ে ফেলে মেরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এইরকম এক সিদ্ধান্ত কোনো মায়ের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অহল্যাবাঈয়ের কাছে মা, পত্নী, বধূর চেয়েও বড়ো দায়িত্ব প্রজাকল্যাণ। ইতিহাসে এইরকম উদাহরণ বিরল। কন্যা মুক্তাবাঈয়ের বিয়ের ব্যাপারে রানির রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্যে চোর, ডাকাতদের অত্যাচারে সব প্রজা ও ব্যবসায়ীরা ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। এই অবস্থায় রানি ঘোষণা করলেন যে ব্যক্তি রাজ্য থেকে চোর ডাকাতদের নির্মূল করতে পারবে তার সঙ্গেই কন্যার বিয়ে দেবেন। যশবন্তরাও ফণসে রানির এই শর্ত পূরণ করল এবং এই বুদ্ধিমান বীরের সঙ্গে মুক্তাবাঈয়ের বিয়ে হলো। মুক্তাবাঈয়ের পুত্র নথ্যাকে রানিমা খুব ভালোবাসতেন। দীর্ঘ রোগ ভোগে সেই নাতির মৃত্যু হলো। অল্পসময়ের মধ্যে নাতি ও জামাতা যশবন্তের মৃত্যুর কারণে রানিমা একেবারে ভেঙে পড়লেন। আরও দুঃখের, কন্যা মুক্তাবাঈ স্বামীর সঙ্গে সহমরণে প্রাণ বিসর্জন দিল। রানিমার মতো এতো দৃঢ়চেতা মহিলাও এতগুলো আঘাত সহ্য করতে অস্থির হয়ে গেলেন। সংসার থেকে প্রথমে স্বামী, পরে শ্বশুর, পুত্র, নাতি, জামাতা চলে যাওয়ার ফলে জীবন থেকে আনন্দ চলে গেল। নিজের জীবনবৃত্তের ফল-ফুল-পাতা মরে যাওয়া শুকনো বৃক্ষের মতো দেখতে লাগল। এতৎসত্ত্বেও প্রজাদের কল্যাণের কথা মনে করে নিজেকে শক্তভাবে দাঁড় করালেন এবং রাজ্যের প্রয়োজনে যথাসম্ভব কাজ করতে থাকলেন।

কুশল রাজনীতিবিদ : অহল্যাবাঈ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে হোলকর রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্বশুর মলহার রাওয়ের সংস্কার ও দিশাদর্শন পাওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে কুশল শাসনের সব গুণের সমাবেশ ছিল, প্রজাদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি লোকমাতা উপাধি পেয়েছিলেন। প্রজাদের মঙ্গল, সুরক্ষা, সুখসুবিধা, বহির্শত্রু আক্রমণ, চোর-ডাকাত ইত্যাদি বিষয়ে রানিমা সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন।

অহল্যাবাঈ নারীবাহিনী তৈরি করে তাদেরকে অস্ত্র চালানো ও যুদ্ধের রণকৌশল শেখাতে আরম্ভ করলেন। রানি তাঁর একজন শত্রু দাদা রাঘোবাকে পত্র লিখলেন— 'আপনি আমার রাজ্যকে অস্থির করতে এসেছেন, এটা আপনার পক্ষে শোভনীয় নয়। আপনি এক নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করলে আপনি কলঙ্কিত হবেন। আপনি আমাকে একজন অসহায় নারী ভেবে যুদ্ধ করতে আসছেন, তার উত্তর আমি যুদ্ধক্ষেত্রে দেব। আমি এক নারী যুদ্ধক্ষেত্রে হেরে গেলে কেউ আমাকে মনে রাখবে না। কিন্তু আপনি হেরে গেলে জগতে হাস্যাস্পদ হবেন। আমি আমার নারীবাহিনী নিয়ে আপনার মোকাবিলা করব। আপনি নিজের ভালো চান তো চুপচাপ পিছু হটে যান।

দাদা রাঘোবা এই পত্র পেয়ে রানির মহিলা-সহ বিশাল সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধের মহড়া দেখে পিছিয়ে গেলেন। রানি এইভাবে বিনাযুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে যুদ্ধজয় করলেন এবং এক শত্রুকে নিজের ব্যবহারের দ্বারা মিত্র করে নিলেন। রানি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। তিনি প্রজাদের সন্তানতুল্য মানতেন। তিনি নিজের শাসনকালে অনেক আইন লুপ্ত করেছেন, কৃষকদের থেকে কম রাজস্ব আদায় করতেন, কৃষি-শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদির সুবিধা করে উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। চোর-ডাকাতদের মানসিক পরিবর্তন করে সঠিকপথে জীবিকা নির্বাহ করতে ব্যবস্থা করলেন। কাশীতে এক ব্রাহ্মণের ঘর পুড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে সঠিক তথ্য জেনে ঘর বানিয়ে তাকে উপহার দিলেন।

জনকল্যাণের মাধ্যম : পথিক, গরিব, বিকলাঙ্গ, সাধুসন্ত, পশুপক্ষী এমনকী জীবজগতের প্রতিও খেয়াল রাখতেন রানিমা, এমনকী সৈনিকদের বা কর্মচারীদের কল্যাণ করতে কোনো প্রকার খামতি রাখতেন না। বেতন সময়মতো দিতেন এবং প্রভুভক্ত কর্মচারীদের বীরত্বের জন্য পুরস্কৃতও করতেন। অহল্যাবাঈয়ের প্রাণ সব শ্রেণীর মানুষের জন্য ব্যাকুল ছিল। তিনি দেশের মধ্যে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছেন, যেমন— বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, রামেশ্বরম, জগন্নাথ পুরী, দ্বারকা, পৈঠান, মহেশ্বর, বৃন্দাবন, সুপলেশ্বর, উম্মেন, পুষ্কর, চিঁচওয়াড়, চিঘলদা, আলমপুর, দেবপ্রয়াগ ইত্যাদি। এছাড়া অনেক নদীঘাট ও অন্নছত্র চালু করেছেন, যেখানে প্রতিদিন সাধারণ মানুষ পেটভরে খেতে পারবে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-সহ সারা দেশে অনেক মন্দির নির্মাণ বা সংস্কার করেছেন। ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশ্রামগৃহ, অযোধ্যা, নাসিকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ, সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ, উজ্জয়িনীতে চিন্তামণি গণপতির মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি কাজ প্রাণ খুলে করেছেন। তিনি দেশের মধ্যে কল্যাণকারী ও পরোপকারী কাজের দ্বারা রাষ্ট্রনির্মাণের মতো মহৎ কাজ এবং সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় একতা স্থাপন করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। এইসব কাজের জন্য তিনি কেবল সম্পত্তি ব্যবহার করতেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চিন্তামণি বিনায়ক বৈদ্য লিখেছেন— 'তাঁর ধার্মিকতার স্তর এতটাই উঁচু যে এই ক্ষেত্রে নিজের নাম অক্ষয় অমর করে রেখেছেন। তাঁর দান ধ্যান করার মহানুভতা হিন্দুস্থানে অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারেনি।

বীরত্বের গুণ : ইতিহাসে রানি অহল্যাবাঈয়ের মধ্যে গৌরবশালী বীরাঙ্গনার গুণ দেখতে পাওয়া যায়। একজন মহিলা সর্বগুণসম্পন্ন হন কী করে? কস্মিনকালে একজন ব্যক্তির মধ্যে এতগুণ দেখা যায়নি, ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। ধর্মাচরণ, প্রশাসন, ন্যায়, বিদ্বানকে সম্মান করা, দানশীলতা, উদার ধর্ম নীতি, ভক্তি ভাবনা, বীরত্ব ত্যাগ, সাহস, শৌর্য ইত্যাদি গুণে গুণান্বিতা রানি অহল্যাবাঈ যুগে যুগে অমর হয়ে থাকবেন। রানি আমাদের সবার কাছে প্রেরণার স্রোত। রানি অহল্যাবাঈয়ের নাম সর্বদা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। □

রাজনারায়ণ বসু : স্বদেশীবোধ জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন মেলার আয়োজক

দীপক খাঁ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বলেছেন— ‘‘আমি এখন শিশু ও যুবকদিগকে ভালোবাসিতে পারি, ইহার মূলে দুই ব্যক্তি আছেন। প্রথম আমার পিতা। তিনি কোনোদিন আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করেন নাই। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতেন। দ্বিতীয়জন হলেন— রাজনারায়ণ বসু। তিনি আমার সহিত সমবয়সীর মতো মিশতেন। শিশুকালে আমার বয়স যখন ৮ বছর, তখন হইতে আমি তাঁহাকে আমাদের বাড়িতে দেখিতাম। তখন তাঁহার পক্ককেশ- গোঁফদাঁড়ি। তিনি যে অতি বড়ো লোক তখন আমরা তাহা বুঝিতাম না। জাপান যাত্রার সময়ে দেখিয়াছি, অতি ভীষণ ঝটিকার মধ্যে জাপানি জাহাজের কর্ণধার আমার সহিত তখনকার বায়ুর গতিবেগ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। এমনকী জাহাজ জলমগ্ন হইলে যাত্রীরা যাহা পরিয়া জলে ঝাঁপ দিবে, তাহার আয়োজন হইয়াছিল; তবুও তিনি আমার সহিত গল্প করিতেছিলেন।’’

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ৭ সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামে বিখ্যাত বসু পরিবারে রাজনারায়ণের জন্ম। পিতা নন্দকিশোর বসু ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ অনুগত। ইংরেজরা গোবিন্দপুরে কেল্লা নির্মাণের কাজ শুরু করলে বসু পরিবারকে বোড়ালে উঠে যেতে হয়েছিল। বাল্য বয়েসেই তিনি সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি ও সাধারণ বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কণ্ঠস্থ করেন। কিছুদিন স্কুলে পড়াশোনা করে রাজনারায়ণ হেয়ার স্কুলে এসে ভর্তি হন। স্কুল শিক্ষক রূপে পেয়েছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক। এসময় কোনও ভাবে তাঁর হাতে পড়ে Chevalier Ramsay রচিত The Travels of Cyrus নামক গ্রন্থটি এবং পরিণামে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভর্তি হন হিন্দু কলেজে, পরবর্তীতে যাঁর নাম হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ। মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এঁরা সকলেই ছিলেন রাজনারায়ণের সহপাঠী। ইয়ং বেঙ্গল-এর প্রভাবে রাজনারায়ণও সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়েছিলেন। কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজন ও মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।

মদ্যপানের আসক্তি হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। টানা ছ’মাস তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল— ফলে কলেজের পড়া আর এগোলো না। কলেজ ছাড়ার কিছুদিনের মধ্যেই জলে ডুবে অকালে স্ত্রী প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হয়। স্ত্রী বিয়োগের আঘাত সহ্য করার মধ্যেই তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু পরলোক গমন করেন।

‘তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে, নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে’— অতি অদ্ভুত পরিবর্তন এর পরে। ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী নিস্তারিণী দেবী ছিলেন হিন্দু পরিবারের কন্যা। কিন্তু স্বামী অনুগতা স্ত্রী বিবাহের পর স্বামীর ধর্মকেই গ্রহণ করেন এবং সুখী দম্পতি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। রাজনারায়ণ তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক হন। কন্যাপক্ষে তিনি যে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লাভ করেছিলেন--- তাঁদের মধ্যে আছেন মনোমোহন, শ্রীঅরবিন্দ ও বিপ্লবী বারীন ঘোষ প্রমুখ স্বনামধন্য ইতিহাস পুরুষরা। ১৮৪৬-৪৯ এই তিন বছরে উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের কাজ করেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের কাজ ছেড়ে মেদিনীপুর সরকারি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। প্রধান

শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে রাজনারায়ণ স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি অনুভব করেন ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে হৃদয় জয় করতে পারলে তার ফল অধিক হয়। দীর্ঘ আঠারো বছর মেদিনীপুর স্কুলে শিক্ষকতা করে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্ম প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনারায়ণের প্রভূত অবদান। এখানেই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতার ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-সহ বহু ব্রাহ্মভক্ত মেদিনীপুর শহরে উপস্থিত হয়েছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁর প্রিয় কর্মক্ষেত্র মেদিনীপুরেই থেকে গিয়েছিলেন। যেখানে তিনি শ্রমিক-কৃষকদের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। রাজনারায়ণ বিধবা বিবাহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজের পরিবারেই জেঠতুতো ভাই দুর্গাচরণ বসু এবং সহোদর মদনমোহন বসুকে বিধবা কন্যা বিবাহ করান। এই কাজের জন্য সমাজের অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। মেদিনীপুর ও বোড়াল গ্রামের অনেক লোকই তাঁর বিরোধী হয়ে উঠেছিল। এমনকী মায়ের তিরস্কারও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু সব অভিযোগ অনুযোগ তিনি নীরবে সহ্য করেছেন। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। রাজনারায়ণ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক।

রাজনারায়ণের কর্তব্যবোধ তেমন সংকীর্ণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়ো, তিনি অর্থাৎ রাজনারায়ণ তাঁর সুহৃদ ছিলেন আবার রবীন্দ্রনাথের মতো শিশুরও তিনি বয়স্য ছিলেন। উপনিষদে আছে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', অর্থাৎ আনন্দ হতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। রাজনারায়ণবাবুর জীবনে এই আনন্দরসের প্রাচুর্য ছিল। তিনি যখন এই সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন, তখন সাহিত্যের শিশু অবস্থা। তখন এর মধ্যে আকর্ষণের কিছু ছিল না। তাঁকে যদি সাক্ষীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হতো— 'এই ভাষায় কী আছে যে তুমি এই ভাষার সেবা করিবে?' উত্তরে তিনি কিছুই দেখাতে পারতেন না। কিন্তু তিনি তো অমনভাবে দেখেননি।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— 'আমার তিনি উৎসাহদাতা ছিলেন। ১৮ বছরের সময় ইংল্যান্ড হইতে ফিরিয়া আমি ভারতী'তে যাহা লিখিতাম, তাহা পাঠ করিয়া আমার লজ্জা হয়, তাহা এখনো ছাপার অক্ষরে আমার প্রতি চাহিয়া আমাকে লজ্জিত করে। রাজনারায়ণ তাহা পরম আগ্রহে পড়িতেন, প্রত্যেকটি বাক্যের সমালোচনা করিয়া দেওঘর হইতে দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। তাঁহার সহৃদয়তাপূর্ণ পত্র পাইবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতাম।"

তিনি মনে করিতেন দেশীয় ভাষাচর্চার দ্বারাই দেশের মানুষের ও দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব। দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'র আয়োজন করেন। সেইসময় ইংরেজিতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেশীয় ভাষার প্রতি অবজ্ঞা এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে বাংলা বলতে তাঁরা লজ্জা বোধ করতেন। রাজনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যরা এই নিয়ম চালু করেছিলেন যে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপে এবং চিঠি পত্রাদিতে কখনও কোনো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবেন না। যদি কেউ ভুলবশত কথা বলার সময় বাংলার সঙ্গে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে ফেলতেন তাঁহাকে প্রতিটি ইংরেজি বাক্য বা শব্দের জন্য এক পয়সা জরিমানা দিতে হতো। কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায়, তিনি প্রথমে গেলেন ভাগলপুরে জ্যেষ্ঠ জামাতা কৃষ্ণধনের বাড়িতে। পরে সেখান থেকে কিছুদিন এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে বসবাস করেন। গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতি সঞ্জীবনী সভারও তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। এই সভা ছিল বাঙ্গালির বিপ্লবী সংগঠনের অগ্রদূত। রাজনারায়ণ যখন যেখানে গেছেন, নানা উপলক্ষ্যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা করে জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি বহু পত্রপত্রিকায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

তৎকালীন জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' লিখেছিল— 'হিন্দু সমাজ ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণবাবু তাহা রক্ষা করিলেন।' স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ দেওঘর যান এবং বাড়ি নির্মাণ করে জীবনের অবশিষ্টাংশ এখানেই অতিবাহিত করেন। নির্জনবাসের ফলে আধ্যাত্মিক বিষয়েও তিনি উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। এই সময় দেওঘরে তিনি 'দোসরা বৈদ্যনাথ' নামে আখ্যাত হতেন।

উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থও প্রণয়ন করেছিলেন রাজনারায়ণ। আত্মচরিত, সেকাল আর একাল, হিন্দু বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত, সায়েন্স অব রিলিজিয়ন, রিলিজিয়ন অব লাভ ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়াও তিনি ইংরেজিতে ব্রাহ্মধর্ম ও আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। এই ঋষিপ্রতিম পুরুষ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে দেওঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ◻

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

গো-রক্ষার লক্ষ্যে ভারতে গো-আধারিত অর্থনীতি—কী ও কেন?

ড. রাসবিহারী ভড়

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।

আমাদের দেশের প্রাচীনত্ব এবং দেশের নামের অভিনবত্ব বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখিত এই সংস্কৃত শ্লোকটিতে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত। যে দেশটি সমুদ্রের উত্তরে এবং তুষারময় পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত তাকে ভারত বলা হয়; এবং এখানে বসবাসকারী সন্তানদের তথা বংশধরদের ভারতী তথা ভারতীয় বলা হয়। ভারতবর্ষে ভারতীয়দের দ্বারা পালিত গোরুর প্রকৃতি বা গঠন, গোপালনের উদ্দেশ্য, গোপালনের অর্থনীতি ও অর্থব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকেই অভিনব। গোরুকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় 'গোমাতা'র স্থান খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ ও মানুষের লালন-পালন এবং পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় ভারতীয় গোরুর অবদান, আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সত্য।

ভারতবর্ষে গো-আধারিত অথনীতির কথা লিখতে গেলে প্রথমেই সংস্কৃত ভাষার অতি প্রাচীন দুটি শব্দ, 'গো' এবং 'বিন্দ'-এর কথা; তথা গোবিন্দ শব্দের উৎপত্তি ও ব্যবহারের কথা স্মরণ করতে হয়। গো থেকেই গাভী শব্দের উৎপত্তি। বিন্দ মানে অন্বেষণ। সংস্কৃতে গো শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে গাইকে যেমন বোঝানো হয়; তেমনি বেদকেও বোঝানো হয়। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। তাই তত্ত্ব অনুসারে ব্যবহারিক অর্থে গোবিন্দ বলতে জ্ঞানের অন্বেষক বলা যেতে পারে। প্রাত্যহিক ব্যবহৃত অর্থে গোরুর পালন কর্তা অর্থাৎ গোপাল বলা হয়। গোবিন্দ শব্দের অর্থ অন্বেষণ করলে জানা যায় শব্দটির ব্যবহারিক উৎপত্তিগত দিকটি— গো + বিদ্ + অ (ন্ আগম)। গোবিন্দ শব্দের ব্যবহার প্রধানত ১. বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ; ২. গোরু সম্বন্ধে যিনি জানেন / গো-বিশেষজ্ঞ; ও ৩. বেদজ্ঞ। সুতরাং সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই পৃথিবীতে গোপালনের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োগ ও প্রসার হয়ে চলেছে। ভারতীয় সভ্যতায় ও সমাজে গো-আধারিত অর্থব্যবস্থার কথা অনাদি অনন্তকাল থেকেই স্বীকৃত ও ব্যবহারিত। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ; তাই ভারতীয় তথা হিন্দুদের মধ্যে দেশি গোরু (অর্থাৎ ভারতীয় প্রজাতির গোরু) গোমাতা রূপে গৃহীত ও গোপাল স্বয়ং ঈশ্বর রূপে পূজিত। পরন্তু বর্তমানের ভোগবাদী, গো-বিমুখ অর্থনীতি আমাদের সমাজ, সভ্যতা ও জীবনশৈলীকে অনেকটাই প্রভাবিত করে চলেছে। ভারতবর্ষের পারম্পরিক জ্ঞানের অজ্ঞানতা আমাদের পরিবেশকে অনেকটাই দূষিত করে ফেলেছে। পরিবেশানুকূল জীবনযাত্রার অভাবে পরিবেশের মধ্যে অসামঞ্জস্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বৈজ্ঞানিকদের একটি অংশ পুনরায় পরিবেশ রক্ষায় ও পরিবেশ সংশোধনের জন্য; পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে গো-আধারিত কৃষি ও অর্থব্যবস্থায় কাজ পুনরায় যুগানুকূল ভাবে, আজকের মতো করে শুরু করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের গো-আধারিত কৃষি ও অর্থব্যবস্থার জ্ঞানপরম্পরা আজকের মতো করে বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে প্রাণী ও কৃষি বৈজ্ঞানিক, সমাজ বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য উৎসাহদান করা হচ্ছে। গো-আধারিত কৃষিব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রয়োগে অনেক জনসেবামূলক কাজ বিভিন্ন কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ট্রাস্টের মাধ্যমে করা শুরু হয়েছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে, অনেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিজেদের পুঁজি ও সম্পদ ব্যবহার করে বা সরকারি / বেসরকারি অর্থসাহায্যে, গো-আধারিত অর্থব্যবস্থার প্রয়োগ সাফল্যের সঙ্গে করে চলেছেন; তথা গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিক স্বনির্ভরতার ছোটো, মাঝারি ও বড়ো মডেলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

গোসেবা সংস্থা গো-আধারিত কৃষিব্যবস্থা প্রচলনের মিশন নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জনসহভাগিতায় বিভিন্ন প্রকারের গোসেবা কাজের প্রয়োগ সাফল্যের সঙ্গে করে চলেছে। 'গো-আধারিত অর্থব্যবস্থা'র উপর গোসেবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ভারতে রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের কাজে গোসেবা সংগঠন নিরন্তর সাধনারত। গোপালন, সামন্বয়িক গোপালন, পঞ্চগব্যজাত বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন, গো-আধারিত কৃষি ও পুষ্টি বাগানের ব্যবহারিক প্রয়োগ হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে। অনেক সেবাব্রতী সামন্বয়িক গোপালনের মাধ্যমে স্বয়ং গো-আধারিত অর্থব্যবস্থার স্থানীয় মডেল তৈরি করে নিজেদের গ্রামে, নিজের ও অন্যান্য আরও অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, নিজেদের সংসার খরচ চালাচ্ছেন; অর্থাৎ, 'গো-আধারিত অর্থব্যবস্থা— কী ও কেন?'— সেটা তাঁরা স্বয়ং উপলব্ধি করছেন ও অন্যান্য আরও অনেককে উপলব্ধি করানোর জন্য স্বদেশ ও স্বধর্মের সংরক্ষণ এবং সংবর্ধনের পারিবারিক বিকাশ মডেল তৈরি করেছেন। স্থান, কাল এবং গোপালকের পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী, মূল সিদ্ধান্ত মাথায় রেখে সামগ্রিক মডেলটির কিছুটা পরিবর্তন করা যেতে পারে। বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনের জন্য বর্তমানের এই লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ, সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। 'গো-আধারিত অর্থনীাতি'র সফল প্রয়োগের জন্য এই বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আরও কয়েকজন ব্যক্তি বা সম্বন্ধিত সংস্থার সঙ্গেও সম্পর্ক করা যেতে পারে। গোবিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্র, কামধেনু ভবন, চিতোর অলি, মোহাল, নাগপুর (info@goyigyan.com; দূরভাষ : +0712-2772273, 2734182)— এই বিষয়ের উপর একটি জাতীয় স্তরের গবেষণা কেন্দ্র। 'ভারতবর্ষে গো-আধারিত অর্থব্যবস্থা— কী ও কেন?'— এই বিষয়টি এক ঝলকে দৃষ্টি গোচরের জন্য উল্লিখিত চিত্রটি সংযোজিত হলো। ■

রক্ষাবন্ধন মানেই বেড়া বাঁধা
নিরাপদ দেশেই একমাত্র সৃষ্টিসুখ

কল্যাণ গৌতম

মনে করুন আপনার অঢেল সম্পদ, বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য, বড়ো চাকরি, বাড়ন্ত ব্যাংক ব্যালেন্স— কিন্তু আপনার দেশ যদি স্থিতিশীল না হয়, একই দেশকে বারবার স্বাধীন করার নামে আপনার দেশে হিংসাত্মক গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে আগুন জ্বালিয়ে জীবন-জীবিকা শেষ করে দেওয়া হয়, তবে আপনার সম্পদের মূল্য কী! তার থেকেও বড়ো সম্পদ কিন্তু আপনার পুত্র-কন্যা, আপনারা স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আপনার আত্মীয়পরিজন। তাদের চোখের সামনে প্রভূত প্রহার, বিপন্ন বলাৎকার, খাবলে খুন, মৃত্যু পর্যন্ত তিলে তিলে পাশবিক অত্যাচার হতে দেখলে এবং সেই প্যানোরামা ছড়িয়ে পড়লে, সে দেশ কি আপনার কাছে নরকতুল্য মনে হবে না?

যেহেতু আপনি সপরিবার সবান্ধব ভালো থাকতে চান, তাই আপনার একটি স্থিতিশীল দেশ চাই, প্রতিবেশীর মানবিক মুখ চাই, আত্মজ্ঞান লাভের নির্ভরযোগ্য ধর্ম থাকা চাই। আর সেজন্যই রক্ষাবন্ধন, রাখিবন্ধনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সেটাই। দেশের সীমানায় সাহসী-অকুতোভয় সৈনিক চাই, যাদের নেতৃত্বে থাকবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও নির্বাচিত সরকার। সেনার হাতে থাকবে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, দুর্জয় মনোবল, সুসংহত জীবন। এই নিরাবদ জীবন কখনও ভোট লুণ্ঠনকারী সরকারের উপর নির্ভর করে রচিত হতে পারে না। মূল্যবান মানবসম্পদ রচিত হবে ত্যাগের মাধ্যমে, সদর্থক ঐতিহ্যের অনুবর্তনে, মঠ-মন্দির-দেবালয়ের শীর্ষবাণী যাপন করে। কোনো অসুর কখনও মানব বা দেবতাকে শান্তি দিতে পারে না। অসুরের কাজই হচ্ছে দেবতুল্য মানুষকে নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত করা।

একটা চিত্রকল্প আমরা সকলেই জানি, শাক্তকবি রামপ্রসাদ সেন গাইছেন, 'মন রে কৃষিকাজ জানো না' আর বেড়া বাঁধছেন; মা-কালী তাঁর বেড়া বাঁধায় সহায়ক হয়েছেন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বৃহত্তর অর্থে একটি বাগান, আমরা সকলে তার জীবনবৃক্ষ; জীবন-জীবিকার সুস্থিতি আর নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় বেড়া দিতে হবে। এরই নাম রক্ষাবন্ধন।

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'আগে দিয়ে বেড়া/তবে ধরো গাছের গোড়া।' অর্থাৎ দেশের বেড়া দিয়েই 'নাগরিক' জীবন-বৃক্ষকে বাইরের অবাঞ্ছিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। তেমনই 'আগে জ্বেলে অগ্নি আলো/তবে করো অন্যের ভালো।' ভারত অন্য দেশ ও জাতিকে ভালো করতে পারবে, যদি নিজের দেশে প্রয়োজনীয় 'যজ্ঞকুণ্ড' জ্বালিয়ে রাখতে পারে। পৃথিবী নামক বড়োবাড়িতে ভারতবর্ষ একটি 'ঠাকুর ঘর'। এ ঘর চূর্ণ করা চলে না। রাতের আকাশে যেমন 'আকাশ প্রদীপ' দিতে হয় পূর্বপুরুষের স্মরণে, পুণ্যাত্মার স্মৃতিতে। পিতৃপুরুষেরা দেখতে চান পরবর্তী প্রজন্ম নিরাপদে আছে, তাই উত্তর প্রজন্মের মানুষেরা আকাশপ্রদীপ দেয়। ভারতেরও উচিত হবে, সম্ভাব্য বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করতে আগুনের গোলা ছোটানোর ক্ষেপণাস্ত্রে নিয়মিত শান দেওয়া। যুদ্ধ নয়; কিন্তু যুদ্ধ বন্ধের জন্য যুদ্ধ-প্রস্তুতি নেওয়া। সতর্ক থাকা, সচেতন থাকা। আসুরিক কাজকে পর্যবেক্ষণ করে সেই মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বেড়া বাঁধার কাজ সম্পন্ন হলেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-নান্দনিকতার যাবতীয় বিস্তার সম্ভব হয়, সেটা কাণ্ডজ্ঞানী সম্পন্ন সৎ মানুষই বুঝতে পারেন। পারেন না কেবল অসৎ, লোভী ও পরনির্ভরশীল মানুষেরা; তাদের পক্ষে বোঝা ও মেনে নেওয়া অসম্ভব। কারণ তাদের মগজ নিয়ন্ত্রিত হয় বাইরের অশুভ শক্তির ইচ্ছেতে। ভাঙা বেড়া ডিঙিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরাই তাদের উদ্দেশ্য, তাদের স্বভাব হচ্ছে দেশের মধ্যে ধ্বাংসাত্মক শক্তির ধারা অব্যাহত রেখে দেশকে নড়বড়ে করে দেওয়া।

'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' আর অবিরাম তোষণ, পদলেহনের ফলে শক্তিমান অনুপ্রবেশকারী এবং বিপজ্জনক শক্তি তথা ভারত বিরোধীরা দেশের সার-জল-মাটি-আলো ভোগদখল করে চলে যাবে— এটা চলতে পারে না। অনুপ্রবেশকারী বা 'ঘুসপেট' হলো ফসলের জমিতে আগাছার মতো; weeds in crop fields। কোনো দেশ কি এমন থাকতে পারে যেখানে অবাঞ্ছিত জনস্রোত আসতেই থাকবে আর দেশের সম্পদে ভাগ বসাবে, আবার দেশের সার্বভৌমত্ব, সুস্থিতি, নিরাপত্তা বিনষ্ট করবে! এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারী সমার্থক নয়। আর প্রকৃত ভারতবাসীর জন্য ভারতের সম্পদ পর্যাপ্ত, কিন্তু ঘুসপেটদের জন্য নয়, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য নয়। এর সঙ্গে বৈধ ভারতীয় অহিন্দুকে গুলিয়ে দিলে চলবে না। পূর্ব প্রতিবেশী দেশে কি উদ্বাস্তু কোনো সমস্যা? না। ওই দেশ তৈরির এত বছরের মধ্যে এদেশের একজন সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুও কি এদেশ ছেড়ে ওদেশে গেছেন? না। শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারীর ডেফিনেশন কি বিজেপি-আরএসএস বানিয়েছে? না। অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির কাজ শুরুর চেষ্টা কি বিজেপি-আরএসএস-এর মস্তিষ্কপ্রসূত? না। এই 'না'-এর কথামালার মধ্যে, এই নিরবচ্ছিন্ন প্যানোরামার মধ্যে এক এবং একান্তভাবে তোষণের গল্প আছে। আর এই নিয়ে আলোচনা করলেই প্রকাশ্যে আসবে পূর্ব-প্রতিবেশী দেশে কীভাবে হিন্দুরা অত্যাচারিত, আর এদেশের উদ্বাস্তু সমস্যা কেন!

শাস্ত্রবাক্য হচ্ছে, 'ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ'। ধর্মকে রক্ষা করলে, ধর্মও আমাকে রক্ষা করবে। The one who destroys Dharma, Dharma destroys them, and one who protects Dharma, Dharma also will pretect them. That's why Dharma should never be destroyed so that the destroyed Dharma can never destroy us. প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরও বলেছেন, 'ধর্ম করিতে যাইয়া যদি মৃত্যু বা যে কোনো প্রকারের বিপদ হয়— সেও ভালো। কারণ ধর্মই শ্রীকৃষ্ণ; ধর্মকে রক্ষা করিলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়।'

আমরা নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণাপ্রতাপ সিংহ' নাটকের গানে পাই 'রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে/শুন ওই ডাকে ভারতমাতা।' ওই নাটকে দেখা যায়, কোষ নিবদ্ধ তরবারি নিয়ে মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমেছে রাজপুত সেনারা। জীবনযুদ্ধ চালানোর জন্য তারা ভারত মা এবং মা কালীর নাম করে রণসাজে সজ্জিত হয়েছে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রণভেরী বাজিয়ে চলেছে। গীতায় ভগবান বলছেন, 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' ভালো মানুষকে রক্ষার জন্য, দুষ্টের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রত্যেক যুগে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বর মানুষের বেশেই আসেন। তিনি অবশ্যই আছেন আমাদের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে দরকার হবে নিখুঁত নির্মিত মানুষ, যারা তাঁর ভক্ত কেবল নয়, তাঁর সৈনিক। তাদেরই বাণী,

'হিন্দুবঃ সোদরা সর্বে।
নঃ হিন্দুর্পতিতো ভবেৎ।।
মম দীক্ষা হিন্দুরক্ষা।
মম মন্ত্র সমানতা।।'

সব হিন্দু আমার ভাই। কোনো হিন্দু কখনো পতিত হতে পারে না। হিন্দুকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম, সমানতাই আমার মন্ত্র। হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য এমনই মানুষ চাই, যাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি মূল্যবান 'রাখি'। ভারতমাতার জন্য তাঁরা বাঁধা হন। তাঁদেরই অধিকার এই গান গাওয়ার—, 'আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে/তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি/তোমার ভয় নেই মা/আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।' তারা ভয়ডরহীন, দুঃখতাপে সান্ত্বনা চায় না, চায় দুঃখকে জয় করতে। কেউ ত্রাণ করবে— এ প্রার্থনা চায় না, চায় নিজের শক্তি, নিজের বল যেন না টুটে যায়। নিজের মন ক্ষয় না মানে। দেশরক্ষার কাজে দুখের রাতে নিখিল বিশ্ব যদি বঞ্চনাও করে, ভগবানের প্রতি সংশয় তবুও যেন না থাকে, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো/এ নহে মোর প্রার্থনা,/ বিপদে আমি না যেন করি ভয়।' রক্ষাবন্ধনের সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য এইরকম। □

বাংলা ভাষার শুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষা

প্রবীর ভট্টাচার্য

‘আমরা যে গাছটিকে কৃষ্ণচূড়া ভেবেছিলাম
যার উদ্দ্যেশ্যে ধ্রপদী বিন্যাসে কয়েক অনুচ্ছেদ প্রশস্তি লিখেছিলাম,
গতকাল বলাইবাবু বললেন, ওইটি ‘বানরলাঠি’ গাছ।

অ্যালসেশিয়ান ভেবে যে সারমেয় শাবকটিকে
আমরা তিনমাস বকলস পরিয়ে মাংস খাওয়ালাম
ক্রমশ তার খেঁকিভাব প্রকট হয়ে উঠেছে।

আমরা টের পাইনি আমাদের ঝরনা কলম কবে ডটপেন হয়ে গেছে
আমাদের বড়োবাবু কবে হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেছেন।
আমাদের বাবা কবে বাপি হয়ে গেছেন,

আমরা বুঝতেই পারিনি,
আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।’

এই কবিতাটি সত্তরের দশকের কবি তারাপদ রায়ের লেখা। তিনি এখন প্রয়াত, তাই জানা সম্ভব নয় তিনি সর্বনাশ বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন? কিন্তু বাঙ্গালির ভাষা, সংস্কৃতি যে ধীরে ধীরে লুঠ হয়ে যাচ্ছে, তা বোধহয় কবি সেই সময়েই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

বাঙ্গালি বলতে যে যে বিষয়ে গর্ববোধ করি তার মধ্যে অবশ্যই আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। কয়েক হাজার বছরের কালের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালি এর সব কটির উত্তরাধিকারী হয়েছে। অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধ বাল্যাবস্থায় পাঠক্রমে ‘বাংলা লিপি’ অধ্যয়ন করেছিলেন খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের কবি অশ্ব ঘোষ তাঁর রচিত ‘বুদ্ধচরিত’-এ তা উল্লেখ করেছেন। হুগলীর সিংহপুরের রাজা সিংহ পুত্র রাজকুমার বিজয় সিংহ নামে এক বাঙ্গালি যুবক সিংহল জয় করেছেন অনায়াসে। যেদিন তিনি সিংহলে পা রাখেন, ঘটনাচক্রে সেই দিনই ছিল ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণ দিবস। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে নানা শাস্ত্রে দিগ্‌গজ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পাণ্ডিত্য সুদূর তিব্বতের জনগণের জীবনযাত্রায় আজও প্রবাহিত। পক্ষধর, রঘুনাথ শিরোমণি, কে নেই বাঙ্গালি সমাজে?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নেপাল থেকে উদ্ধার করা চর্যাপদগুলি বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায় কত গভীর অধ্যয়নের ছোঁয়া রয়েছে এই জাতির চেতনায়। তাকে কেবলমাত্র হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে আটকে রাখা একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। বাঙ্গালির হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের শরিক হতে চায় না যারা তারাই বাঙ্গালির ইতিহাসকে এই সময়ের কালখণ্ডে বেঁধে রাখতে চায়।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্তবংশীয় এক যুবক বঙ্গের বিভিন্ন জনপদ ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীন সার্বভৌম্য নৃপতি হন। তিনিই গৌড়াধিপতি মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব। মহারাজা শশাঙ্কের পরবর্তী সব রাজাই নিজেদের ‘গৌড়েশ্বর’ নামে পরিচয় দিয়েছেন। ষষ্ঠ শতক ধরে

এগিয়ে চললে গৌড়াধিপতি মহারাজা নরেন্দ্র আদিত্য শশাঙ্ক, গৌড়েশ্বর পরম ভট্টারক ধর্মপাল, গৌড়েশ্বর পরম ভট্টারক দেবপাল, মহারাজা বল্লালসেন, মহারাজা লক্ষ্মণ সেন, রাজা পৃথুদেব রায়, রাজা চন্দ্রনাথ, উজানীপতি বিক্রমজিৎ ঘোষ, পঞ্চ গৌড়েশ্বর গণেশনারায়ণ ভাদুড়ী, রায়বাঘিনী মহারানি ভবশঙ্করী, মহারাজ বীর হাম্বীর মল্লদেব, রায়শ্রেষ্ঠ মহারাজা প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, কর্ণগড়েশ্বরী মহারানি শিরোমণি প্রমুখর বীরত্বপূর্ণ অসামান্য কাহিনিগুলি বাঙ্গালির ইতিহাসে তুলে ধরাই হলো না। যদি তুলে ধরা হতো, তবে বাঙ্গালি উপলব্ধি করতে পারত কোন বীরবংশে তারা জাত। কিন্তু এদের যথার্থ ইতিহাস কই?

শশাঙ্কের রাজত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 'গৌড়তন্ত্র' এবং 'বঙ্গাব্দ'র সূচনা। আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন এই রাজার কৃতিত্ব কেড়ে নেওয়ার এক অপচেষ্টা ইদানীং প্রচার মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বঙ্গাব্দের রূপকার শশাঙ্ক নন, তা মুঘল বাদশা আকবর। এই মতবাদের উৎস প্রতিবেশী ভূখণ্ড বাংলাদেশ। হুসেন শাহর নবাবি আমলই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের যথার্থ সময়কাল— এই মতবাদকে সামনে রেখে সত্তরের দশকেই বাংলাদেশে বাংলাভাষা ও লিপির আমূল সংস্কার করা হয়।

তন্ত্রশাস্ত্র মতে শরীরই হলো ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ। শরীর ছাড়া চেতনার স্তরে পৌঁছনো যায় না। এই চেতনার স্তরে পৌঁছাতে শরীরের ছ'টি কাল্পনিক চক্রকে সাধনার দ্বারা উন্মোচিত করার কথা বলা হয়ে থাকে। এই চক্রগুলিকে ষটচক্র বলা হয়। মুণ্ডমালা তন্ত্রে এই প্রতিটি চক্রে বীজমন্ত্র রূপে কতগুলি বর্ণের অবস্থান রয়েছে। মহাকালী কণ্ঠে যে পঞ্চাশটি নরমুণ্ড ধারণ করে আছেন তা সবগুলিই বাংলা ভাষার এক একটি বর্ণ বলে পণ্ডিতদের মত। মহাকালী যে ছিন্ন মুণ্ডটি হাতে ধরে থাকেন তা হলো ওঙ্কার অর্থাৎ প্রণব মন্ত্র। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই দেবীকে বারবার জ্ঞানের দেবী বলে সম্বোধন করেছেন। বলা হয়ে থাকে '...কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসী রূপে করে রমণ। যোগীরা এই ষটচক্রকে পদ্ম বলে থাকেন।

ভারতীয় যোগ দর্শনের ষটচক্রের রহস্যভেদ করে সাধক অনন্ত ব্রহ্মের সন্ধান পায়। এই সাধনায় দেহাভ্যন্তরে ছটি চক্র কল্পিত একেকটি মহাপদ্ম রূপে। নিভন্ত এই পদ্মের পাপড়িগুলি এক একটি বর্ণ। সাধক তপস্যার দ্বারা একে প্রস্ফুটিত করেন অনন্তকে উপলব্ধি করার জন্য। এই সংস্কৃতির অবিশ্বাসীরা লিপি ও শব্দের পরিবর্তন তো আনবেই! তাই রবীন্দ্রনাথের গানে যেখানে মন্দির রয়েছে সেখানে পরিবর্তন করে বসানো হয়েছে উপাসনালয়। শ্মশান হয়ে গেছে কবর। এই পরিবর্তনের শরিক পশ্চিমবঙ্গের স্বঘোষিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে বামপন্থী মতাদর্শ প্রতিনিয়ত ধ্বংস করেছে বাঙ্গালির চিরায়ত ইতিহাস, ভাষা সংস্কৃতিকে। বাঙ্গালির ভাষার প্রতি চিরায়ত আবেগ ও ভালোবাসা লুকিয়ে আছে মানভূম, শিলচর, দাড়িভিটের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে।

তবু, এক অজানা রহস্যে একুশের মিথ্যা ইতিহাসের মোহের জালে বাঙ্গালি আটকে রয়েছেন বছরের পর বছর। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে সেদেশের সেনা প্রধানের নাম চোখে পড়ল। ওয়াকার উজ জামান। কলকাতার দৈনিক একটি সংবাদপত্রে 'উজ' ও 'জামান' এই দুই শব্দের বর্গীয়জ শব্দের তলায় একটি করে ফুটকি দিয়ে একটি আরবীয় উচ্চারণের চেষ্টা চালিয়েছে ওই সংবাদপত্র— যাদের না পড়লে নাকি বাঙ্গালিকে পিছিয়ে পড়তে হয়! ফুটকির প্রয়োগ যে বিদ্যাসাগরীয় বাংলা বর্ণমালায় নেই, তা কিন্তু নয়। সংস্কৃত 'য' বর্ণটি বাংলাতেও বোঝাতে 'য' বর্ণে একটি ফুটকি বসিয়ে তিনি 'য়' বর্ণ তৈরি করেছিলেন। 'ড' এবং 'ঢ' বর্ণেও ফুটকির প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। ধ্বনিকে বেশিক্ষণ ধরে রাখার ক্ষমতা কানের নেই। তাই ভাষণধ্বনিকে চেনাবার ও বোঝাবার জন্য প্রত্যেক জাতি নিজের বর্ণমালায় বিশেষ চিহ্ন বা অক্ষর ব্যবহার করে। এই প্রতীক চিহ্নই এক একটি বর্ণ। কোনো জনসমাজে মানুষের দ্বারা যে ভাবব্যঞ্জক কথা বা বাক্য সমষ্টি উচ্চারিত হয় অথবা রচিত হয়, তাই তার ভাষা। ভাষ ধাতুর অর্থ কথা বলা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে কথা বলা হয় তাই ভাষা। আমরা জানি মানুষের মনের ভাব একটি নয়, অসংখ্য। মানুষ এক-একটি বাক্যে এক-একটি ভাব প্রকাশ করে। এই ভাবে মানুষের দ্বারা অজস্র কথা বা বাক্য সৃষ্টি হয়।

ভাষা বলতে সেইসব কথা বা বাক্যকেই বোঝায়। প্রতিটি জাতি তার সংস্কৃতির বিচারেই তাঁর ভাব প্রকাশ করে। বাঙ্গালিকে এখন বুঝতে হবে 'জ'-এর নীচে ফুটকি দিয়ে বাঙ্গালি কোন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হতে চায়? যদি তা না হতে চায়, তবে বাঙ্গালি তাঁর শত্রু চিনুক। □

নতুন করে চেনা

''একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
'চেয়ে দেখো' 'চেয়ে দেখো' বলে যেন বিনু,
চেয়ে দেখি, ঠোকাঠুকি বরগা-কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।''

কলকাতা— শহর নয়, যেন একগুচ্ছ স্মৃতি। বড়ো রাস্তায় ছুটছে গাড়ি। ওই! ওই শোনা যায় দূর থেকে রাস্তার বুক চিরে ছুটে আসছে ট্রাম— ঘড় ঘড়। রাস্তার এক ধার দিয়ে ওই চলে যায় টানা রিকশা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ঘোড়ায় চেপে আছেন শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। গোলাবাড়ির কষা মাংসের গন্ধে জিভে জল চলে আসছে। আহা, কী স্বাদ! পাশেই ফুটপাথে ফুলের দোকান। মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে গোলাপ, রজনীগন্ধা, আরও কত ফুলের।

এই হলো কলকাতা— শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও ভালোবাসায় মাখা এক সোনালি শহর। শুধু তাই নয়, কলকাতা মানে রং, কলকাতা মানে সংস্কৃতি, কলকাতা মানে ঐতিহ্য, আলো, আশা, হাসি, শান্তি, স্মৃতি, কী নয়!

হাজার হাজার কবিতা ও গানের প্রেরণা এই শহর। কলকাতা স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এবং আবেগ দিয়ে আগলে রাখা শহর। শহরের হৃদয় স্পর্শ করে বয়ে চলেছে মা গঙ্গা। স্নিগ্ধ তার হাওয়া। এপার থেকে লাফ দিয়েছে হাওড়া ব্রিজ— রবীন্দ্র সেতু। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ঘাটে মা ভবতারিণীকে উৎসর্গ করা ফুল ভেসে যায় গঙ্গাজলে।

একটু দূরে, জোড়াসাঁকোতে কবিগুরুর স্মৃতিধন্য ঠাকুরবাড়ি স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে— ছন্দে ছন্দে মাতোয়ারা। আরও একটু দূরে, চারিদিকে রংবেরঙের ফুলের বাগান নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আরও একধারে ইডেন গার্ডেন--- চারিদিকে ক্রিকেট আর ক্রিকেট।

এদিকে কলেজ স্ট্রিটের শোভাই আলাদা। কফি হাউসে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা একটা আলাদাই ব্যাপার। মান্না দে'র গানের সুর কানে ভেসে আসে। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি বইয়ের দোকান। এখানেই দাঁড়িয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তরদিকে আর একটু এগিয়ে গেলেই কুমোরটুলি— সারা বছর প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে।

দুর্গাপূজার সময় কলকাতাকে দেখলে মনে হবে যেন কেউ জাদুকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে শহরটার গায়ে। আলোয় আলোয় ঝলমল করে সারা শহর। এই শহরেই আমার বড়ো হয়ে ওঠা, পড়াশোনা।

কল্লোলিনী কলকাতা, তিলোত্তমা কলকাতা। অনাদিকাল হতে এই শহর ভারতবর্ষের অন্যতম শক্তিপীঠ। এই কারণে সুপ্রাচীন এই জনপদ 'কালীক্ষেত্র' নামে ছিল পরিচিত, পরবর্তীকালে 'কালীক্ষেত্র' নাম হতেই 'কলকাতা' শব্দের উৎপত্তি।

গঙ্গাপাড়ে তোমার জন্ম। তোমায় বলতে ইচ্ছে করছে, ভালো থেকো কলকাতা। কলকাতা, কলকাতা, ডোন্ট ওরি কলকাতা। তোমায় আমি অনেক ভালোবাসি।

রূপসা রায়, নবম শ্রেণী

পর্বত পরিচয়

জয়চণ্ডী পাহাড়

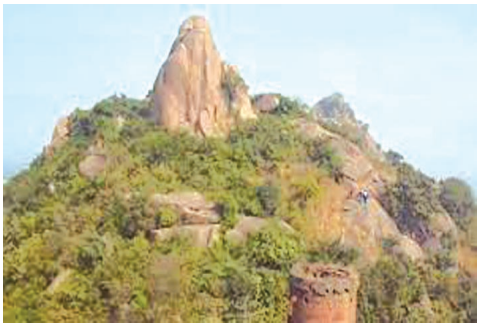

জয়চণ্ডী পাহাড় পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত একটি পাহাড়শৃঙ্খল। বেশ কয়েকটি পাহাড় নিয়ে এটি গঠিত। প্রতিটি পাহাড়ের নিজস্ব নাম আছে, যেমন– যোগীঢাল, চণ্ডী, ঘড়ি, সিজানো, রাম-সীতা প্রভৃতি। মহকুমা শহর রঘুনাথপুর থেকে দুই কিলোমিটার এবং আদ্রা শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে পুরুলিয়া-বরাকর রোডের ধারে অবস্থিত জয়চণ্ডী পাহাড়। বর্তমানে এটি একটি পর্যটন কেন্দ্র এবং পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছে।

উল্লেখযোগ্য হলো, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত **হীরক রাজার দেশে** ছবির শ্যুটিং এই এই পাহাড়ে হয়েছিল।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৩৫

পর্যাপ্তম্ (যথেষ্ট)
ভোজনম্ পর্যাপ্তম্।
খাওয়া যথেষ্ট হয়েছে। (আর প্রয়োজন নেই)
অভ্যাস করি–
ক্রন্দ্রনং পর্যাপ্তম্। শয়নম্ পর্যাপ্তম্। দুঃখ পর্যাপ্তম্। স্নানং পর্যাপ্তম্। ভ্রমণম্ পর্যাপ্তম্। কার্যং পর্যাপ্তম্। উপহসনম্ পর্যাপ্তম্। পীড়নম্ পর্যাপ্তম্।
প্রয়োগ করি–
কিং কিম্ পর্যাপ্তম্?
ধনম্, পঠনম্, চিন্তনম্, ভ্রমণম্, নাটকম্, শয়নম্।
বিশেষ দ্রষ্টব্য—খাওয়া হয়ে যাবার পর আমরা যেমন বলি, পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট অর্থাৎ আর প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র সেই স্থলে 'পর্যাপ্তম্' ব্যবহার হবে।

ভালো কথা

ভুলুর বন্ধু

আমাদের ভুলু প্রতিদিনই একবার উঠোনে দাঁড়িয়ে উপর দিকে মুখ করে ভৌ করে ডেকে উঠে শুয়ে পড়ে। আর তখনই কোথা থেকে দুটো শালিক উড়ে এসে ভুলুর গায়ে বসে ঘাড় বাঁকিয়ে কী যেন বলে। তারপরই ভুলুর গা থেকে এঁটুলিপোকা বেছে বেছে খেতে শুরু করে। খাওয়া শেষ হলে ভুলুর মুখে ঠোঁট দিয়ে আদর করে। তখন ভুলু উঠে বসে শালিক দুটোর গায়ে মাথায় চেটে দেয়। তারপর শালিক দুটো উড়ে চলে যায়। প্রতিদিন একবার করে ওদের এই খেলা চলে। বাবা বলেন, ভুলুর সঙ্গে শালিক দুটোর খুব বন্ধুত্ব।

রেখা মাহাত, ষষ্ঠশ্রেণী, খাতড়া, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

মাথায় হাত

আদিত্য পাল, সপ্তম শ্রেণী, বড়জোড়া, বাঁকুড়া।

মা পুশিটা মিও মিও
ছানা দুটো চিঁও চিঁও,
মা পুশিটা ইঁদুর ধরে
ছানা দুটো খেলা করে।

পুশির ভয়ে যত ইঁদুর
ভয়ে সব দূর দূর,
ইঁদুরের জ্বালাতন কমে গেছে
আমার মায়ের মুখে হাসি ফুটেছে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

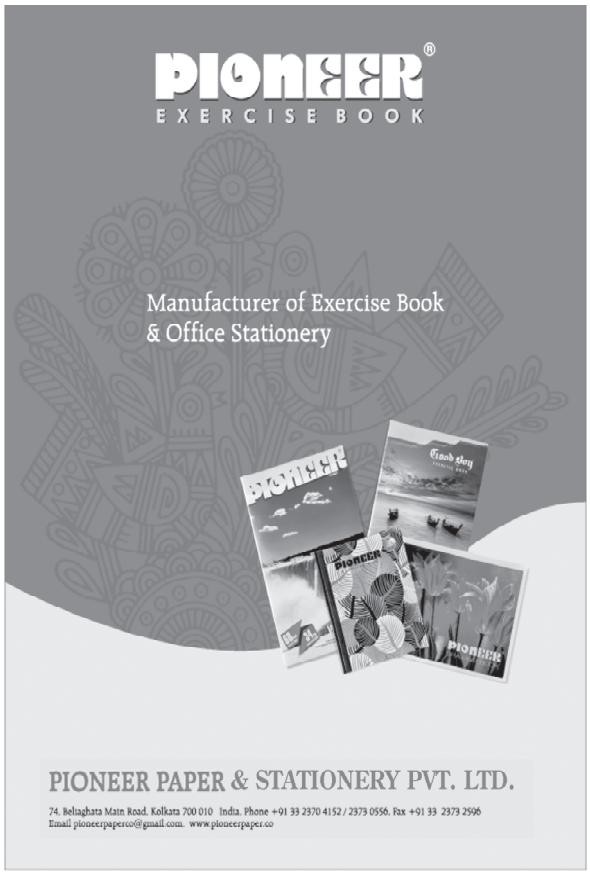

With Best Compliments from -

A
Well wisher

শেখ হাসিনার পতন এবং ভারতের তুষ্টীকরণ রাজনীতির ভবিষ্যৎ

ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুরা যদি সংগঠিত হন এবং কোনো জাত বা মিথ্যা বিভাজনের ষড়যন্ত্রে প্ররোচিত না হন তখন দেখবেন আপনার প্রতিও রাজনীতির মানুষেরা আকর্ষণ বোধ করবেন।

ডাঃ সুভাষ সরকার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ নিষ্ঠা সহযোগে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই, ভারতবাসীর পূর্ণ সমর্থন, ভারত সরকারের সহযোগিতা এবং ভারতের সেনাবাহিনীর লড়াই, আত্মত্যাগ ও বিজয়ের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। একটি ভূখণ্ডকে অত্যাচারী শাসকের নিকট থেকে মুক্ত করে সেখানকার অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। বর্তমানের বাংলাদেশের মানুষের হাতে তাদের নিজেদের শাসনভার অর্পণ করে ভারতের সেনাবাহিনীকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদাহরণ বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। এটা সম্ভব হয়েছে তার কারণ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু--- যাদের সংস্কৃতিতে অন্য দেশ আক্রমণের উদাহরণ নেই— বৈদিককাল থেকে আজ অবধি। বাংলাদেশের ৭৩ বছরের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির চড়াই-উতরাইয়ের ইতিহাস আমাদের সকলের জানা আছে। ১৯৭৩, ২০১৫ ও ২০২১ সালে বাংলাদেশ যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে আমি তখন মেডিক্যাল ছাত্র। পাবনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও খুলনা— এই চারটি জেলায় গিয়েছিলাম। বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলার যে স্মৃতি আছে, তাতে একজন ব্যতীত আর সকলেই হিন্দু বিদ্বেষী বা ভারতবিদ্বেষী। সেই একজন ছিলেন প্রাক্তন মুক্তি যোদ্ধা।

২০১৫ সালে গিয়েছিলাম একটি সেমিনারে। সেমিনারের বিষয় ছিল ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান’ একজন বাংলাদেশের মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে অত্যন্ত আবেগঘন কণ্ঠে বলেছিলেন আমি একবার দিল্লি গেছিলাম, ট্রেনে কলকাতা আইতাছি। দেখা হইল এক আর্মি অফিসারের লগে। আমার পরিচয় জাইন্যা কইল আমার বাবা আমার জন্মের আগেই বাংলাদেশের যুদ্ধে শহিদ হইছিল, কইতে পারেন বাংলাদেশে কোথায় গিয়া আমার বাবারে শ্রদ্ধা জানাইতে পারুম?’ ২০১৫ সালে ওই মন্ত্রী প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভারতীয় সৈন্যদের জন্য একটি পৃথক স্তম্ভ নির্মাণের। সরকারি চাকরিতে হিন্দু প্রার্থীর ইন্টারভিউয়ের কাহিনিও শুনেছিলাম। হিন্দু যুবক ভালো উপস্থাপনা করায় যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তিনি বললেন তুই ভালো কইছিস কিন্তু তোর নাম কেন কৃষ্ণ হইল রে, তোরে দিতে পারলাম না।

রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা কালীবাড়ি, সর্বত্রই অনুভব হয়েছিল একটি ভয়ের বাতাবরণ অর্থাৎ কট্টরবাদীদের প্রভাব। ২০২১ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে বাংলাদেশ গিয়েছিলাম। সেখানে তো একটি প্রোটোকলের মধ্যে থাকতে হয়, তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে কম কথা হয়েছে। এবারে ৩৬ দিনের পালাবদলের ঘটনাক্রম যদি দেখি—

- ১ জুলাই সরকারি চাকরির কোটা

ফঃ ৬

সংস্কারের দাবিতে পথে ছাত্ররা।

● ১৬ জুলাই ঢাকাতে বিক্ষোভকারী ও সরকার পন্থীদের সংঘর্ষ। হত ৬, ছাত্ররা পুরো শাটডাউন করল।

● ১৮ জুলাই হাসিনার আহ্বান ফেরালেন বিক্ষোভকারীরা। হত ৩২।

● ১৯ জুলাই কার্ফু ঘোষণা। ৬৬ হত।

● ২০ জুলাই রাজাকার বলে বিতর্কে হাসিনা।

● ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট সরকারি চাকুরিতে ৯৮ শতাংশ মেধাভিত্তিক নিয়োগ মুক্তিযোদ্ধা-সহ বাকি ক্ষেত্রে মোট ৭ শতাংশ সংরক্ষণের রায় ঘোষণা করল।

● ২২-২৫ জুলাই হত ১৪৬, সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণা সত্ত্বেও।

● ২৬-২৭ জুলাই বিএনপি'র সরকার উৎখাতের ডাক।

● ১-২ আগস্ট নিষিদ্ধ জামাত শিবিরের নেতৃত্বে বহু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পথে নামল।

● ২ আগস্ট বিএনপি-জামাতসহ সকলের সম্পূর্ণ অসহযোগ ঘোষণা।

● ৪ আগস্ট নিহত প্রায় ৩০০।

● ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা এবং বোন রেহানা-সহ বাংলাদেশ ত্যাগ।

এরপরই দেখা গেছে মোল্লাবাদীরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন লুটপাট, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ধানমুণ্ডির বাড়িতে আগুন। এই ছত্রিশ দিনের সময়কালে ভারতে কেউ কেউ অতি উৎসাহে ছাত্রদের সমর্থনে না বুঝেই শোভাযাত্রা বের করলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। যেমন কিছুদিন আগে কেন্দ্রের সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে সমর্থন করেছিলেন। এইসবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য একটাই, যেহেতু মুসলমানরা সংগঠিত, তাই তাদের পক্ষ সমর্থনে নাট্যমঞ্চ তৈরি করা। 'আগে কে-বা প্রাণ করিবেক দান।' এইরকম আর কী। এরা কেউই মুসলমানদের উন্নয়ন চায় না, চাইলে যারা মড়াকান্না কাঁদেন তাদের নেতৃত্বের রাজ্য সরকার ভারতের সংখ্যালঘু উন্নয়নের টাকা অন্য খাতে খরচ করতেন না। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পরও ২০০ মানুষের নৃশংস হত্যা হয়েছে আমরা যদি ৩৬ দিনের ইতিহাস দেখি— ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পরেও ২২ জুলাই থেকে ২৫ জুলাই আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি হলো। ২৬ ও ২৭ জুলাই আন্দোলনের পিছনের লোকেরা অর্থাৎ বিএনপি নেতারা সরাসরি উৎখাতের ডাক দিল। এর পরই ১ ও ২ আগস্ট জামাত শিবির ছাত্র শিক্ষকদের যাদের পিছন থেকে প্ররোচনা দিচ্ছিল তারা সামনে এসেই নেতৃত্ব দিল— চূড়ান্ত আঘাতের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা অবস্থার বিভীষিকা এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসলীলা দেখে কেন্দ্র সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন এবং কেউ তুষ্টীকরণের বাক্য উচ্চারণ করেননি, এর জন্য ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের নেতারা এবং দেশজুড়ে প্রতিপক্ষের নেতারা প্রায়শই তুষ্টীকরণের প্রতিযোগিতা করে থাকেন আর তার ফলেই তৈরি হয় জেহাদি শক্তি বৃদ্ধি। দেখবেন গোধরা, উন্নাও, হাথরসের ঘটনা প্রসঙ্গ ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু রাজনৈতিক নেতারাই বারবার উত্থাপন করেন। কিন্তু হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা ধুলাগড়, কুলতলী, রানীগঞ্জের মতো অন্যান্য প্রদেশেও অসংখ্য ঘটনার কথা কখনো উত্থাপন করেন না।

হিন্দু জন্ম ও সংস্কৃতিবোধ সূত্রে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন। অন্য ধর্মের মানুষ ও নেতাদের কাছেও বারবার একই বার্তা দেওয়ার মতো সৎসাহস রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, তুষ্টীকরণের মাধ্যমে জেহাদিদের শক্তি বৃদ্ধি যেন না করি।

তুষ্টীকরণ কেমন হতে পারে :

টেলিভিশনে দেখতে পাওয়া গেছে, অসংখ্য হিন্দুর উপর অত্যাচার এবং অনেক হিন্দু মন্দিরে আগুন, আবার একটি ছবি সামনে এসেছে মুসলমানরা একটি হিন্দু মন্দিরের সামনে প্রহরারত। কয়েকদিন পরই দেখা যাবে ভারতে মেকি সেকুলারিজমের পূজারি এবং বাম, অতিবামেরা এই দ্বিতীয় ছবিটির কথা বারবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বলছেন। অর্থাৎ যা কিছু বলতে হবে সংখ্যার আধারে এবং সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলা যাবে না। মুসলমান নেতা-মন্ত্রীরা সাম্প্রদায়িক কথা বললে সামাজিক ও প্রশাসনিক স্তরে প্রতিবাদ এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার মতো সৎসাহস থাকা চাই। এই প্রথা মানলেই জেহাদিদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে না।

ক্ষমতার লোভে এদেশের নেতা-নেত্রীরা মুসলমানদের তোষণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকে বারে বারে করে আসছে। কংগ্রেস এবং তাদের উপজাত দলসমূহ এবং কমিউনিস্টরা বারবার এই কাজ করে এসেছে। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতের তুষ্টীকরণপ্রিয় রাজনীতিবিদরা দেখুন, তাদের মুসলমান ভাইয়েরা অনায়াসে ইসলামে দাওয়াত না দিয়ে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাই তুষ্টীকরণের রাজনীতি থেকে সাবধান। ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুরা যদি সংগঠিত হন এবং কোনো জাত বা মিথ্যা বিভাজনের ষড়যন্ত্রে প্ররোচিত না হন তখন দেখবেন আপনার প্রতিও রাজনীতির মানুষেরা আকর্ষণ বোধ করবেন এবং তুষ্টীকরণের নাটক বন্ধ হবে। তাই আজকের বার্তা হোক— তুষ্টীকরণের রাজনীতি নিপাত যাক। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হিংসার তীব্র প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ জুড়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপরে যে বর্বরোচিত অত্যাচার শুরু হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদে সর্বত্র মুখর হয়েছে ভারতের বাঙ্গালি সমাজ। ৫ তারিখের পর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে জেহাদিদের দ্বারা মঠ-মন্দির ধ্বংস, হিন্দুদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, দোকান লুঠ, হিন্দু গণহত্যা, মহিলাদের সম্ভ্রমহানির মতো বীভৎস ও ভয়াবহ ঘটনার দৃশ্যাবলী সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রতিবেশী দেশে ক্ষমতার পালাবদলের এই অছিলায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবন, সম্পত্তি, নারীর সম্ভ্রম আজ অতিশয় বিপন্ন। হিন্দুদের ওপর নারকীয় অত্যাচার চলছে অবাধে। হিন্দু পৌরপিতাকে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করে রাস্তায় উলটো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসকনের মন্দির-সহ অজস্র মন্দির, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জামাতপন্থী জেহাদিদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে দেওয়ার এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টার প্রতিবাদে গত ৮ আগস্ট, বেলা ১টায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে কলকাতায় একটি প্রতিবাদী পদযাত্রা আয়োজিত হয়। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশনে পৌঁছায়। পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশ জুড়ে সংঘটিত হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। পদযাত্রা শেষে প্রতিবাদীদের তরফে বাংলাদেশ হাইকমিশনে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

গত ৯ আগস্ট, দুপুর ৩টায় কলকাতা প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশে ঘটে চলা ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন করে 'বাঙ্গালি অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ'। এই প্রেস কনফারেন্সে সাহা ইন্সস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষক ড. জিষ্ণু বসু জানান যে, বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নৃশংস অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে, তার প্রতিবাদে তাঁদের এই সাংবাদিক সম্মেলন। সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয় আগামীদিনে তাঁরা পথে নেমে এর প্রতিবাদ করবেন।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ড. জিষ্ণু বসু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (আইএসিএস, কলকাতা)-এর অধ্যাপক অয়ন দত্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পবিত্র পাল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবাশিষ চ্যাটার্জি এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন্সের অধ্যাপিকা পাপিয়া মিত্র প্রমুখ। ড. জিষ্ণু বসু পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কটাক্ষ করে বলেন, যারা গাজায় কোনো ঘটনা ঘটলে বিশ্বমানবাধিকারের স্লোগান তুলে কলকাতার রাস্তাঘাটে মোমবাতি মিছিলে ভরিয়ে দেন, তারা বাংলাদেশে হিন্দু মা-বোনেরা ধর্ষণের শিকার হলে তাদের মানবাধিকারের কথা বলেন না। এটা চরম

পরিতাপের বিষয়। বাংলাদেশ ও গাজার সংস্কৃতি এক নয়। কিন্তু বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। বাংলাদেশে কোনো ঘটনা ঘটলে তার আঁচ পশ্চিমবঙ্গে এসে পড়ে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত প্রগতিশীলরা ভুল বুঝিয়ে যুক্তিহীন কিছু মিথ্যা ন্যারেটিভ সাজিয়ে বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর ধারাবাহিকভাবে যে পাশবিক অত্যাচার চলছে তাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ শুধু মাত্র একটি ভূমিখণ্ড নয়। সেখানে আমাদের মা আছেন, ভাইয়েরা আছেন, আমাদের সংস্কৃতি রয়েছে, আমাদের ভিটেমাটি রয়েছে। তাই ইজরায়েলের গাজার থেকে বাংলাদেশের ঘটনা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপুর্ণ। তিনি বলেন, আজ যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে বসে কথাগুলো বলছি, সেখানেও বঙ্গবন্ধুর নামাঙ্কিত একটি কক্ষ রয়েছে। কারণ আমরা তাঁকে এখনও সম্মান করি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে বাংলাদেশে মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই দেশের জাতীয় সংগীত রচয়িতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিও ভেঙে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন, যেভাবে তথাকথিত ছাত্র আন্দোলনের নামে প্রতিবেশী দেশে জেহাদি শক্তির উত্থান আমরা দেখলাম তা অতি ভয়ংকর। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের পেছনে যে জেহাদিদের ভারত বিরোধী আন্দোলন লুকিয়ে রয়েছে তা আমরা দেখেছি। এখন জেহাদিরা চলে এসেছে প্রকাশ্যে। তাদের তরফে নির্মম অত্যাচার চলছে হিন্দুদের ওপর। এই জেহাদিদের পেছনে বড়ো মাপের আন্তর্জাতিক শক্তির প্রভাব রয়েছে। তাদের আর্থিক মদতে এই হিংসাত্মক আন্দোলনকে সংগঠিত করে জেহাদিরা একটা সরকারের পতন ঘটিয়েছে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য আমরা, কলকাতার বাঙ্গালি অধ্যাপক ও গবেষক শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব। সাধারণ হিন্দু নাগরিক সমাজের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যারা এখনও পড়শি দেশে ঘটে চলা হিংসাত্মক ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন, তাদের বলি যদি বাংলাদেশে আজ হিন্দু না বাঁচে, তাহলে আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দু বাঁচবে না। বাংলাদেশের ঘটনায় যারা এখনও উদাসীন, ভবিষ্যতে তারা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে চলে যেতেই পারেন, কিন্তু যদি পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের বেঁচে থাকতে হয়, টিকে থাকতে হয় তাহলে সবাই মিলে একত্রে বাংলাদেশের এই নিদারুণ হিংসার ঘটনার প্রতিবাদ করুন।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু বিজ্ঞানী, গবেষক, অধ্যাপকদের ওপর যাতে অত্যাচার নেমে না আসে, সেজন্য তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দাবি করে ভারতের ২০ জন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও স্বনামধন্য বিজ্ঞানীদের স্বাক্ষর সংবলিত একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন অধ্যাপক অয়ন দত্ত। বাংলাদেশে হিন্দুদের সার্বিক সুরক্ষা, অত্যাচারের কোপে পড়া হিন্দুদের ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সহায়তাদান, হিংসায় আহত ও আক্রান্ত হিন্দুদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, হিন্দু মন্দির ও কমিউনিটি সেন্টারসমূহের নিরাপত্তা, ঘরের বাইরে বেরোনো হিন্দু মহিলা, শিক্ষাঙ্গনের উদ্দেশে বেরোনো হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত উদ্বাস্তু হিন্দুরা যদি শরণার্থী হিসেবে ভারতে প্রবেশ করেন, তবে তাদের উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার মতো দাবিসমূহ এই বিবৃতিতে উত্থাপিত হয়।

গত ৯ আগস্ট দুপুর ৩টার সময় 'ইউনাইটেড হিন্দুজ অফ ইউএসএ'-র উদ্যোগে আমেরিকার নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যালয়ের সামনে একটি 'প্রোটেস্ট র‍্যালি' আয়োজিত হয়। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর চলতে থাকা ভয়াবহ নির্যাতনের প্রতিবাদে সোচ্চার হন প্রবাসী ভারতীয়রা। সংখ্যালঘু মানুষদের ওপর অত্যাচার বন্ধে বাংলাদেশের সরকারকে সতর্ক করতে, হিন্দু গণহত্যা বন্ধে বাংলাদেশ সরকারকে কড়া বার্তা পাঠানোর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তাঁরা। ইউএন বিল্ডিঙের সামনে আয়োজিত এই র‍্যালিতে উপস্থিত প্রতিবাদী হিন্দুসমাজ জোরালো ভাবে বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বাঁচানোর দাবি তোলেন।

১০ আগস্ট বেলা ২টো ৩০ মিনিটে বাংলাদেশে জেহাদিদের দ্বারা হিন্দু- খ্রিস্টান-বৌদ্ধদের গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং ভারত সরকারের হস্তক্ষেপের দাবিতে সাধু-সন্তদের তরফে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোসের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের নেতৃত্বে, সমস্ত সাধু-মহাত্মাদের সহযোগিতায় রানি রাসমণি রোডে জমায়েত এবং এই ডেপুটেশন কর্মসূচি আয়োজিত হয়।

গত ১৭ আগস্ট শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের (২ নং গেট) সামনে দুপুর ৩টায় বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে, সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে, সাধু-সন্তদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়— 'হিন্দু ধর্ম মহাসম্মেলন'। এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় এরকম প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। □

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫'৫", সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য।
যোগাযোগ :
৮৭৭৭৮১৬৪০০

পরলোকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (১ মে ১৯৪৪—৮ আগস্ট ২০২৪) ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। ফরিদপুরের বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ফরিদপুরের পণ্ডিত ছিলেন। পুরোহিত দর্শন, বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ, দুর্গাপূজা পদ্ধতি-সহ বহু বই তিনি লিখে গেছেন। তাঁর পিতা দেশভাগের পর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে পুঁথিপত্র নামে একটি বইয়ের দোকান খোলেন। সেই দোকানে একসময় বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা থেকে বিভিন্ন পুরাণ, উপক্রমণিকা-সহ ভাটপাড়া এবং নবদ্বীপের বহু পুঁথি পাওয়া যেত।

বুদ্ধদেববাবুরও কলাবিদ্যার দিকে ঝোক ছিল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। কিন্তু সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বুদ্ধবাবুকে অন্য পথের পথিক বানিয়ে দেয়। ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ, খাদ্য আন্দোলনে প্রেসিডেন্সি কলেজ উত্তাল। এর মধ্যে একে একে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি তাঁদের ব্যবসা স্থানীয় অসৎ ব্যবসায়ীদের বিক্রি করে চলে যেতে থাকলে, কাজের পরিবেশ নষ্ট হতে থাকে কলকাতায়। চাকুরীহীন যুবকরা বাম ও অতিবাম রাজনীতির দিকে ঝুঁকতে থাকে। সেই সময় যুবক বুদ্ধদেবও সেই দিকে যান। স্নাতক হবার পর তিনি দমদমের আদর্শ বিদ্যামন্দিরে কিছুদিন পড়ান এবং পরবর্তীকালে সংসদীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২-তে কাশীপুর এবং ১৯৮৭ থেকে ২০২১ পর্যন্ত যাদবপুরের বিধায়ক ছিলেন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর জীবন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দর্শন এবং রাজনীতি থেকে পাওয়া তত্ত্বের এক দ্বন্দ্ব। অন্তরের ভালো মানুষ যার ইচ্ছে সমাজের ভালো করা, কিন্তু কাজের সময় বিদেশি তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতা। ১৯৭৭ থেকেই পারিবারিক যোগের জন্য তাঁকে তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে তাঁকে নগরোন্নয়ন দপ্তর দিলে বহরমপুর-সহ বহু স্থানে ব্যক্তিগত ইগোর জন্য সরকার ও প্রশাসনের ক্ষতি হয়। এক সময় ১৯৯৫ সাল নাগাদ জ্যোতিবাবুর দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'চোরেদের মন্ত্রীসভায় থাকবো না' বলে 'দুঃসময়' নাটক লিখে তিনি পদত্যাগ করলেও, ১৯৯৬-তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ফিরে আসেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই হন উপমুখ্যমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তাঁর রেকর্ড ভালো নয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেরিয়ে আসে স্মৃতিতীর্থ/ভট্টাচার্য পরিবারের প্রকৃত মানুষ। ২৪ বছর খরার পর শিল্প আনার চেষ্টা করেন। এই সময় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লক্ষ্য করেন রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি দেশবিরোধীদের আখড়া হিসেবে গড়ে উঠছে। ঠিক করেন ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু পার্টি আটকে দেয়। এরপরে ২০০৪ এবং ২০০৬-তে মুসলমান ভোটের উপর ভর করে উনি বিপুল জয়লাভ করেন। কিন্তু সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম এবং কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদ বামেদের মুসলমান ভোটে ধস নামায়। ২০০৯ এবং ২০১১-তে পরাজিত হয় সিপিএম। তার হারের কারণও কিন্তু মূলত মুসলমান ভোট এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের দূরত্ব বৃদ্ধি। ২০০৬-তে ক্ষমতায় এসে বেশ কিছু নতুন সমস্যায় পড়েন বুদ্ধদেববাবু। কলকাতায় মেয়র হন বিকাশরঞ্জন, যার সঙ্গে সুব্রত মুখার্জীর তুলনা হতে তিন দশক পর শহুরে বাঙ্গালি নতুন বিকল্পের দিকে ঝোঁকে। গ্রামে শুরু হয় বার্ড ফ্লু। বুদ্ধদেব সরকার হাজার হাজার মুরগি মেরে ফেললেও, ক্ষতিপূরণ ঠিক সময় দেননি ড. অসীম দাশগুপ্ত। খেপে যায় মুসলমান সমাজ। এরপরে শুরু হয় রেশন লুট। মিঠুন চক্রবর্তীর একটি সিনেমা বের হবার পর গ্রামে গ্রামে শুরু হয় এই লুট। এর ফলে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নীচের দুই লেভেলে কংগ্রেস ও তৃণমূল জোট প্রায় আধা রাজ্য দখল করে নেয় ২০০৮-এ।

এই হারের পর মুসলান ভোট ফিরে পেতে তিনি যা করলেন, তা হিন্দু বাঙ্গালির ৪০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে ভীষণ বিপদে ফেলেছে। তা হলো ওবিসি সংরক্ষণ মুসলমানদের দিয়ে মাহিষ্য, সদগোপ, বণিক, তিলি, কৈবর্ত্যদের প্রতি অশেষ বঞ্চনা।

তবে সবার শেষে একটা কথা যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একজন তথাকথিত সৎ রাজনীতিবিদ, যিনি আড়াই দশক কুশাসনের পর পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি চাওয়ার ভাবভঙ্গী দেখিয়েছেন। বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনসমক্ষে দেখিয়েছেন যে তিনি বাঙ্গালির গরিমা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। এক সময় কিউবায় গিয়ে তিনি বলেন, তিনি পণ্ডিত পরিবারের একমাত্র সদস্য যিনি কমিউনিস্ট। পত্রিকা লেখে, উনি নাকি নিজেকে বলেছেন, 'দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সিপিএম পার্টিতে উনি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। একমাত্র মানুষ যিনি প্রকৃত উন্নতি চেয়েছেন। বামপন্থী ছুঁৎমার্গ ত্যাগ করে বুঝেছেন মুক্তবাজার অর্থনীতি। চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গকে মাদ্রাসামুক্ত করতে। কিন্তু পারিবারিক দর্শন এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের দ্বন্দ্বে জিতেছে তত্ত্ব। হেরেছে রাজ্য। □

সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল আনল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ৮ আগস্ট দুপুরে সংসদে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বিলটিকে সংখ্যালঘু মন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। এই আইন সংশোধনের মূল লক্ষ্য হলো একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তির নথিভুক্তিকরণ

নিয়ন্ত্রণ। আইন সংশোধন করার আগেই এটি নিয়ে সরব হয়েছিল বিরোধী পক্ষ ইন্ডিজোট।

প্রস্তাবিত সংশোধনীটি গ্রাহ্য হলে ওয়াকফ আইনটির নতুন নাম হবে--- 'ইউনিফায়েড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট এমপাওয়ারমেন্ট এফিশিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট'। এই প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলে পুরনো আইনটিতে ৪৪টি সংশোধনী আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে এই আইন সংশোধনের মূল লক্ষ্য হলো একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তির নথিভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা। এছাড়াও প্রস্তাবিত অন্যান্য সংশোধনীগুলির মধ্যে রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের পাশাপাশি প্রতিটি রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ড গঠন। যেখানে মুসলিম মহিলা ও অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

১৯৫৪ সালে প্রথম ওয়াকফ আইন পাশ হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনে সংশোধনী এনে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। তারপর থেকে বোর্ডের এই একচ্ছত্র অধিকার নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছিল। সরকারের যুক্তি, এবার বিষয়টিতে স্বচ্ছতা আনতে চলতি বিলে ৪৪টি সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বর্তমানে ওয়াকফ আইনের ৪০ নম্বর ধারা অনুযায়ী যে কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণা করার অধিকার ছিল ওয়াকফ বোর্ডের হাতে।

ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে বারবার গরিব মুসলিমদের সম্পত্তি, হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও অন্যান্য মত-পথ ও সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্পত্তি জোরপূর্বক অধিগ্রহণের অভিযোগ উঠেছে। নতুন সংশোধনীতে ওয়াকফ বোর্ডের সেই একচ্ছত্র অধিকার সমাপ্ত করে কোনো সম্পত্তি পরিদর্শন ও সেই সম্পত্তি ওয়াকফ কিনা সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হবে জেলাশাসক বা সম-পদমর্যাদার কোনো আধিকারিকের হাতে। ওয়াকফ সম্পত্তি বিষয়ক বিবাদ ও এই সংক্রান্ত মামলা বর্তমান আইন অনুযায়ী ছিল ওয়াকফ আদালতের অধীন। সংশোধনী বিল পাশ হলে শরিয়তি আদালতের এই কাজির বিচার শেষ হয়ে ওয়াকফ সম্পত্তিজনিত যাবতীয় বিবাদের বিচার জেলা আদালতে হবে।

ওয়াকফ সংশোধনী অনুযায়ী নবগঠিত কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হবেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী। এছাড়া কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যেও আনা হবে রদবদল। নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কাউন্সিলে দু'জন অমুসলমান সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি রাজ্যগুলিতে শিয়া ওয়াকফ বোর্ড গঠন হবে যার সব সদস্য হবে শিয়া। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড হলে তাতে থাকবেন কেবল সুন্নিরা।

সংসদে এই সংশোধনী বিল উত্থাপনের বিরুদ্ধে নোটিশ দেয় কংগ্রেস সাংসদ সি. বেণুগোপাল ও হিবি ইডেন। এই বিলের বিরোধিতা করে সংসদে দাঁড়িয়ে বারবার ভারতীয় সংবিধান উদ্ধৃত করে ভিন্ন মতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলছে বলে তারা মিথ্যা আস্ফালনও করতে থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই বিলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা মাত্রই তারা চিৎকার করতে থাকে। তাদের মতে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের রাজনীতি উসকে দিতে এই বিতর্কিত বিল পেশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অবধেশ প্রসাদ বলেছেন, এই বিলটি ওয়াকফ সম্পত্তি দখলের জন্য সরকারের একটি প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, বিলটি সংসদে পেশ হওয়ার সময় বিল সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান খোলসা করবে সমাজবাদী পার্টি। শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী)-র সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী বলেন, সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে এই বিল আনা হচ্ছে তো? ইন্ডিজোটের তরফে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের এই তীব্র বিরোধিতা, বিলের বিরোধিতা করে জারি করা সাম্প্রদায়িক বিবৃতি— তাদের জেহাদি তোষণের রাজনীতি এবং ভারত জুড়ে ল্যান্ড জেহাদ ও ইসলামিকরণের গোপন এজেন্ডার পর্দাফাঁস করে দিয়েছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। □

আরজি কর হাসপাতালে পড়ুয়া ডাক্তারের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তোলপাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৯ আগষ্ট শুক্রবার উত্তর কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে স্নাতোত্তর এক তরুণী ডাক্তারের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ওইদিন হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলা সেমিনার হল থেকে দ্বিতীয়বর্ষের এক তরুণী ডাক্তারের ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় চিকিৎসকমহল থেকে শুরু করে সর্বত্র। এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের অপদার্থতা ও নিরাপত্তা ব্যর্থতার প্রতিবাদে একযোগে সোচ্চার হন রাজ্যের চিকিৎসকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই দিন নাইট ডিউটিতে কর্তব্যরত ছিলেন ওই তরুণী ট্রেনি ডাক্তার। মৃতার বাড়ি সোদপুরে। প্রাথমিকভাবে এই মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মৃতদেহের বিভিন্ন জায়গায় গভীর ক্ষত ও আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গিয়েছে। আরজিকর হাসপালের একাংশ পড়ুয়া ডাক্তারদের অভিযোগ, যে চারতলায় ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে কোনো সিসিটিভির ব্যবস্থা ছিল না। তাই প্রকৃত ঘটনা এখনও সামনে আসেনি। হাসপাতালের চরম অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তাররা।

এদিকে হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর প্রাথমিক ময়না তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বলে জানিয়েছেন ওই হাসপাতালের পড়ুয়া ডাক্তাররা। তারা জানিয়েছেন, ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে, এমনটাই ইঙ্গিত মিলেছে ওই রিপোর্টে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তরুণীর গলার একটি হাড় ভেঙেছে এবং রাত ৩ টা থেকে সকাল ৬ টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। তাই প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে ধর্ষণের পর গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে ওই তরুণীকে। শরীরের প্রায় দশটি জায়গায় ক্ষত চিহ্নের দাগ পাওয়া গিয়েছে। এমনকী যৌনাঙ্গেও রক্ত পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা জানিয়েছেন, ঘটনার পরের দিন সকালে অর্ধনগ্ন অবস্থায় শিক্ষার্থী ওই ডাক্তারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের পরিবারের তরফে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে এই ঘটনার পর রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে যান নগরপাল বিনীত গোয়েলও। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি 'সিট' গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে আরজি কর হাসপাতাল চত্বর। অবিলম্বে প্রকৃত দোষীকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা মিছিল শুরু করেন শহরজুড়ে। প্রবল চাপের মুখে আরজি কর হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার জেরে গত ১১ আগস্ট সরিয়ে দেওয়া হয় আরজি কর হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠকে। তার জায়গায় আনা হয় বুলবুল মুখোপাধ্যায়কে।

অন্যদিকে, আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারা হুশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এই ঘটনার পর ১২ আগস্ট থেকে আরজি কর হাসপাতাল সহ শহরের সরকারি ও বেশকিছু বেসরকারি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। জরুরি পরিষেবা সহ অন্যান্য বিভাগও এই কর্মবিরতির আওতায় থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তাদের বক্তব্য, এই নৃশংস ঘটনার কোনো একজনের কাজ নয়। একাধিক জন মিলে এই পাশবিক ঘটনা সংঘঠিত করেছে। এই ঘটনার পেছনে কোনো বড়ো মাথা থাকতে পারে। এই ঘটনার পুর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এসব বুঝেই হয়তো কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩১

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা